দস্যু বনহুর

ইরান সাগরে দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

শিউরে উঠলো জীমস্ মীরা, সমস্ত সাগরতল যেন তোলপাড় হচ্ছে। একি হলো! কেন এমন হচ্ছে ভেবে পাচ্ছে না সে। কোথায়ই বা গেলো তার সেই অজানা বন্ধু, যে তাকে বলেছিল......তোমাকে তোমার পিতার কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমাকে বাঁচতেই হবে জীমস্। কই, সে তো আর ফিরে এলো না। জীমস্ মীরা ভয়ে কাঁপছে, তার চারপাশে হাজার হাজার দানব যেন গর্জন করে ছুটে আসছে। নির্জন পাতাল-গহ্বরে সে আজ সম্পূর্ণ একা।

জীমস্ মীরা দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে কেঁদে উঠে—কে কোথায় আছো বাঁচাও.......

জীমস্ মীরার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি সাগরতলের ডুবন্ত পাহাড়ের পাথরে পাথরে আছাড় খেয়ে ফিরে আসে। কেউ নেই যে সাড়া দেবে তার ব্যাকুল আহ্বানে।

উচ্ছল জলরাশির ভয়ঙ্কর হুঙ্কার! কানে তালা লাগছে যেন। মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীটা যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে একাকার হয়ে ভেঙ্গে পড়বে তার মাথায়।

মিস জীমস্ মীরা যখন ডুবন্ত গুহার মধ্যে ভয়ে ছুটোছুটি করছে তখন বনহুরের সাবমেরিনখানা একটা ছোট্ট কুটোর মত তীরবেগে ছুটে চলেছে। কোন্ দিকে কোথায় চলেছে জানে না সে।

উত্তাল তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাতে মাঝে মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিলো বনহুরের সাবমেরিনটা। বনহুর শক্তভাবে হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে বসে আছে, একটু এদিক ওদিক হলেই মৃত্যু!

বুঝতে পেরেছে বনহুর, তার রেখে আসা তিনটা ডিনামাইটে একসঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটেছে। নিশ্চয়ই কিউকিলার দেহটা ডুবন্ত পাহাড়ের টুকরার মত খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেছে।

বনহুরের সন্দেহ সত্য—কিউকিলা যেমন তার গুহায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করছে অমনি তার হাঁটুর নিচে ডিনামাইট চাপা পড়ে বিস্ফোরণ

ঘটেছে। বনহুরের আলোকস্তম্ভের রশ্মি কিছু করতে না পারলেও ডিনামাইটের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পেল না। পাহাড়ের টুকরার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহটাও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়লো।

কিউকিলা প্রচণ্ড তোলপাড় শুরু করলো মৃত্যু যন্ত্রণায়।

হঠাৎ ঝাম সাগরবক্ষে এই বিস্ফোরণ দৃষ্টিগোচর হলো ঝামবাসীদের। 'শাহী' জাহাজখানা তখন ঝাম বন্দরে নোঙ্গর করা ছিল, রহমান এবং বনহুরের অন্যান্য অনুচর এ সংবাদ পেয়ে বিস্মিত হলো। খবর পেয়ে ছুটে এলেন মহারাজ মোহন্ত সিন্ধু আর ঝাম সর্দার দলবল নিয়ে। মালাও পিতার সঙ্গে এসেছে, সবাই 'শাহী'তে চেপে কিছুদূর অগ্রসর হলো, একেবারে সাগরমধ্যে যাওয়ার সাহস কেউ পেল না। ক্যাপ্টেন বোরহান বললো— সমুদ্রগর্ভে হঠাৎ এমন বিস্ফোরণ ঘটলো; নিশ্চয়ই কোন আগ্নেয়গিরি থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটেছে, কাজেই আর এগুনো উচিত হবে না।

ক্যাপ্টেনের কথায় সবাই নার্ভাস হয়ে পড়লো, এমন কি রহমান পর্যন্ত জাহাজ নিয়ে এগুতে সাহসী হলো না! কিন্তু রহমানের মনে এক ভীষণ সন্দেহের দোলা জাগলো। তাঁর সর্দার যে ডিনামাইটগুলো নিয়ে সাগরতলে প্রবেশ করেছিল, সেগুলোই আজ সাগরগর্ভে বিস্ফোরণ ঘটেছে।

সবাই যখন সাগরবক্ষের উন্মত্ততা নিয়ে নানারকম আলাপ-আলোচনা করছে তখন রহমান আর মোহন্ত সিন্ধু চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে দূরে, বহুদূরে লক্ষ্য করছিল। সেদিনের পর থেকে সর্দারকে হারিয়ে তারা সর্বহারা হয়ে পড়েছে।

রহমানের চোখে ঘুম নেই, আহার-নিদ্রা যেন ভুলে গেছে সে। সর্দারকে ঝাম সাগরে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে কি করে এই মুখ নিয়ে ফিরে যাবে! তাই সে ফিরে যায়নি, আজও রহমান বুকভরা আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে ঝাম সাগরে 'শাহী' নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। সবাই জানে, তাদের সর্দার আর জীবিত নেই, তাকে কিউকিলা হত্যা করেছে। কিন্তু রহমানের মন যেন ডেকে বলছে, না সে মরেনি, মরতে পারে না।

হঠাৎ রহমানের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়লো দূরে, বহু দূরে পাহাড়ের মত জমকালো কিছু একটা বস্তু সমুদ্রজলে তোলপাড় করে একবার ডুবছে, একবার ভেসে উঠছে।

'শাহী' জাহাজ থেকে সবাই স্পষ্ট দেখতে লাগলো। বহুদূরের ব্যাপার হলেও প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে 'শাহী' জাহাজখানা দোল খেতে লাগলো। জাহাজের ডেকে স্থির হয়ে দাঁড়ানো যেন মুশকিল হয়ে পড়েছে।

রাজা মোহন্ত সিন্ধু, ঝাম সরদার, রহমান এবং অন্যান্য সকলে বিস্মিত হয়ে দেখছে ঐ বস্তুটা কি হতে পারে, তবে অনুমানে সবাই ধারণা করে নিলো, ওটা কিউকিলা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

রহমান 'শাহী' জাহাজের ক্যাপ্টেন বোরহানকে আদেশ দিলো জাহাজখানাকে আরও এগিয়ে নেবার জন্য।

তখন অবশ্য সেই জমকালো পর্বতসম বস্তুটা স্থির হয়ে এসেছে। বিপুল আগ্রহ নিয়ে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলো, অল্পক্ষণেই তারা দেখতে পাবে সেই বস্তুটা।

রহমান এবং ক্যাপ্টেন বোরহান দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে লক্ষ্য করছে।

'শাহী' জাহাজখানা এবার গভীর সমুদ্র অভিমুখে এগুতে লাগলো। জাহাজ যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই জাহাজের যাত্রিগণ বিস্মিত হয়ে দেখতে পাচ্ছে, তাদের সম্মুখে একটি ডুবন্ত পাহাড় যেন ভাসমান অবস্থায় রয়েছে।

জমকালো পাহাড়টার দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছে 'শাহী' জাহাজ, ততই সকলের মনে আতঙ্ক আর আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। জাহাজে মালাও এসেছে পিতার সঙ্গে। সেও কুঁকড়ে গেছে ভয়ে, না জানি ওটা কি!

রহমান বললো—মহারাজ, ওটা কিউকিলার মৃতদেহ বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছে এবং কিউকিলাকে সর্দারের ডিনামাইটই নিহত করতে সক্ষম হয়েছে।

রহমানের কথায় মহারাজের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মালাও আনন্দধ্বনি করে বললো—দেবরাজ তাহলে বেঁচে আছে রহমানজী?

রহমানের মুখখানা কিন্তু খুশিতে দীপ্ত হয়নি, সে গম্ভীর ব্যথাভরা গলায় বললো—তিনি বেঁচে আছেন না মারা পড়েছেন এখন বলা মুশকিল।

বোরহান বললো—গভীর সাগরতলায় এতক্ষণ কারো বেঁচে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। ডুবুরী ড্রেসের অক্সিজেন পাইপে অক্সিজেন গ্রহণ করে

চব্বিশ ঘণ্টা কেউ বাঁচতে পারে—তার বেশি নয়। সর্দার প্রায় একশত চব্বিশ ঘণ্টা হলো সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করেছেন।

মালার মুখ কালো হয়ে উঠলো। একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুকটা তার কেঁপে উঠলো ভীষণভাবে। আজও মালা বিশ্বাস করতে পারছে না দেবরাজ আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। মালা তাকে ভালবেসেছিলো অন্তর দিয়ে।

জাহাজখানা একসময় জমকালো পর্বতসম ভাসমান বস্তুটার অতি নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো। সবাই যেন স্তব্ধ অবাক হয়ে পড়লো, বিরাট আকার বস্তুটা অন্য কিছু নয়—কিউকিলার বিশাল দেহ এবার স্পষ্ট বুঝতে পারলো তারা।

রহমানের নির্দেশে জাহাজখানা আরও নিকটে নিয়ে যাওয়া হলো। কিউকিলাটা সম্পূর্ণ নীরব নিস্পন্দ হয়ে গেছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের আঘাতে একটু একটু দোল খাচ্ছে ভাসমান পর্বতের মত। যদিও তারা অনুমানে বুঝতে পারলো কিউকিলা জীবিত নেই—তবু সহসা কেউ সাহস পাচ্ছিলো না নিকটবর্তী হতে।

রহমান নিকটে পৌঁছে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলো কিউকিলার সমস্ত দেহটা ক্ষত-বিক্ষত মনে হচ্ছে যেন বিরাট একখানা লৌহদেহ থেতলে গেছে জাঁতাকলের চাপে।

রহমান তার সঙ্গীদের বললো—বড়ই আফসোস, কিউকিলাকে যে হত্যা করলো সে কোথায় এখন, জানি না সে জীবিত আছে কিনা। সর্দার কিউকিলার বাসস্থানে ডিনাইমাইট রেখে ফিরে আসতে চেষ্টা করছিল কিন্তু সে ফিরে আসতে পারেনি। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো, একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো আবার—কিউকিলাকে কোন শক্তি কাবু করতে সমর্থ হয়নি কিন্তু সর্দারের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। কিউকিলার সমস্ত দেহটা ডিনামাইটের আঘাতে থেতলে গেছে, তার সঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে কিউকিলার আবাসস্থল ডুবন্ত পাহাড়টা।

রহমানের কথাগুলো সম্পূর্ণ সত্য তাতে কোন ভুল নেই। রাজা মোহন্ত সিন্ধু এবং জাহাজ 'শাহীর' সকলে রহমানের কথাগুলো অবাক হয়ে শুনতে লাগলো।

এবার রহমানের আদেশে কিউকিলাটাকে তীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলে প্রস্তুত হলো। কিন্তু এতবড় জীব কিভাবে তীরে নেওয়া সম্ভব হবে।

রাজা মোহন্ত সিন্ধুর আনন্দ যেন ধরছে না, তাঁর রাজ্য আজ রাহুমুক্ত হয়েছে কম কথা নয়। হাজার হাজার ঝামবাসী নরনারীর জীবন রক্ষা পেল কিউকিলার কবল থেকে। কিন্তু তাঁর একটা দুঃখ যার জন্য আজ তারা বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেল সে নেই। বিশেষ করে মালাকে অর্পণ করার কথা ছিলো তারই হাতে।

মোহন্ত সিন্ধু আনন্দিত হয়ে সম্পূর্ণ খুশি হতে পারছিলো না। মালার মুখ বিষণ্ন মলিন হয়ে পড়েছে। সে পিতার উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছিলো কেন তিনি দেবরাজকে সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করতে অনুমতি দিয়েছিলো।

মোহন্ত সিন্ধু অনেক করে বুঝাতে লাগলেন—তাঁর কোন দোষ নেই, দেশবাসী এবং জনগণকে বিপদমুক্ত করার জন্যই তিনি এ কাজ করেছেন। মুখে যতই তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করুক কিন্তু তাঁর অন্তরটিও একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো, ডিনামাইট দিয়ে ঘুমন্ত পাহাড়টা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে তেমনি। মোহন্তসিন্ধুও যুবকটাকে ভালবেসে ফেলেছিল বিশেষ করে তার সুন্দর ব্যবহার আর সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

যতই ভাবুক আর সে ফিরে আসবে না, তাই নীরবে মালাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ওদিকে রহমান দলবল নিয়ে কিউকিলাকে তীরের দিকে নেবার জন্য পরামর্শ শুরু করে দিলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ সময় নষ্ট করা চলবে না, কিউকিলার বিরাট দেহটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হলো। জাহাজের বড় বড় রশি নামানো হলো। শুধু রশি নয় শিকল দিয়েও আটকাতে হবে কিউকিলার দেহটা।

রশি নামানো হলো, শিকল ঝুলিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু কিউকিলার দেহে সে রশি বা শিকল আটকাবে কে? কেউ সাহসী হচ্ছে না এ ব্যাপারে। মৃত কিউকিলাকেও ভয়াবহ বলেই মনে হচ্ছে তখনও।

শেষ পর্যন্ত রহমান আর তার সহকারী মাহবুব নিজেই কিউকিলার দেহের সঙ্গে শিকল আটকাতে মনস্থ করলো।

তারা ছোট লাইফবোট নামিয়ে নিল জাহাজ থেকে, তারপর দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লো বোটে। অতি নিকটেই কিউকিলার ভয়ঙ্কর ভীষণ আকার দেহটা। রহমানের সাহসী অন্তরটাও শিউরে উঠলো যেন।

কিউকিলার দেহটা আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। রহমান আর বিলম্ব না করে কিউকিলার হাতের সঙ্গে এবং পায়ের সঙ্গে মোটা রশি ও শিকল দিয়ে বেঁধে জাহাজের সঙ্গে আটকে ফেললো। তারপর জাহাজে ফিরে এলো রহমান ও মাহবুব।

জাহাজখানাকে তীরের দিকে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো রহমান।

মস্তবড় 'শাহী' জাহাজ বিরাটদেহী কিউকিলাটাকে টেনে নিয়ে তীর অভিমুখে এগিয়ে চললো।

সংবাদ পেয়ে ঝাম অধিবাসিগণ সবাই এসে জড়ো হয়েছে ঝাম সমুদ্রতীরে। নর-নারী যুবক-বৃদ্ধ-অগণিত জনগণ সকলেরই চোখেমুখে যেমন বিস্মিত ভাব তেমনি আনন্দ-উচ্ছ্বাস। যে ভয়ঙ্কর জীবের ভয়ে তারা অহরহঃ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতো— দিনের শান্তি, রাত্রির ঘুম পালিয়ে গিয়েছিল তাদের জীবন থেকে, সেই জীবটা আজ নিহত হয়েছে। সবচেয়ে বড় আনন্দ—আজ তারা বিপদমুক্ত।

শহরের প্রত্যেকটা ব্যক্তি এসে জমায়েত হয়েছে, ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করছে তারা, দেখতে চায় কেমন সে জীবটা যে তাদের এভাবে হত্যা করে চলেছিলো।

'শাহী' জাহাজখানা কিউকিলার পর্বতসম দেহটা নিয়ে ধীরে ধীরে তীর অভিমুখে এগিয়ে আসছে ঠিক যেন একটি জাহাজ আর একখানা ডুবন্ত জাহাজকে টেনে আনছে।

একসময় 'শাহী' তীরের অনতিদূরে এসে পৌঁছেছে।

কিন্তু কিউকিলার বিরাট দেহটা একেবারে তীরের সন্নিকটে পৌঁছতে সক্ষম হলো না, আটকে গেলো গভীর জলের মধ্যে।

রহমান কিন্তু ক্ষান্ত হলো না অন্যান্য অনুচরসহ কিউকিলার দেহটাকে তীরের নিকটে আনতে নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। অনেক করে তবেই তার কিছুটা আনতে পারলো। এখন কিউকিলার সম্পূর্ণ দেহটাই প্রায় পানির উপরে জেগে আছে। এবার লোকজন সবাই মৃত কিউকিলাকে দেখার জন্য

ছোট ছোট নৌকাযোগে তীর ছেড়ে সমুদ্রে নেমে পড়লো। কেউবা মোটর বোট নিয়ে কেউবা স্পীড বোট নিয়ে। সকলেই মনে বিপুল আগ্রহ— এবার তারা জীবনটাকে ভালভাবে দেখতে পাবে।

যারা এখনও মৃত কিউকিলাকে দেখে ভয় পাচ্ছিলো তারা চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে দেখতে লাগলো।

রহমান কয়েকজনকে নিয়ে কিউকিলাটাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। তাদের সঙ্গে ছিলো ঝাম বৈজ্ঞানিক রাসেল। মৃত কিউকিলাটিকে পরীক্ষা করে তিনি জানালেন, একমাত্র ডিনামাইট বিস্ফোরণেই এই ভয়ঙ্কর জীবটার মৃত্যু ঘটেছে। রাসেল আরও বলেন—কিউকিলার দেহের চামড়া এত পুরু যে গণ্ডারের চামড়ার চেয়েও শত শত গুণ শক্ত ও কঠিন —যে চামড়া আলোকরশ্মির তীব্র তাপেও দগ্ধীভূত হয়নি। তবে রহমান এবং অন্যান্য সকলে দেখলো, কিউকিলার মৃতদেহের মুখ আর দেহের স্থানে স্থানে ঝলসানো।

রাসেল বললেন—কিউকিলার দেহে যে অগ্নি ঝলসানো স্থান দেখা যাচ্ছে, এগুলো আলোকরশ্মি স্তম্ভের সাংঘাতিক রশ্মি দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

কিউকিলার মৃতদেহ নিয়ে ঝাম শহরে যখন মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে তখন গভীর সমুদ্রতলে দস্যু বনহুর সাবমেরীনসম যান নিয়ে জীম্‌স মীরার সন্ধানে ডুবন্ত পর্বত গুহায় অন্বেষণ করে ফিরছে। সমুদ্রতলে জলোচ্ছ্বাসের ভীষণ আঘাতে জলযানটা ছিটকে পড়েছে অনেক দূরে কয়েক মাইল তফাতে।

হাঙ্গর, কুমীর, তিমি আরও অসংখ্য সামুদ্রিক জলজীবের পাশ কেটে তীর বেগে ছুটে চলেছে বনহুরের জলযানটা। এখন অবশ্য স্পীড কমে আসছে অনেক কারণ তাকে গভীর জলের তলায় পথ অন্বেষণ করে নিতে হচ্ছে। জীম্‌স মীরাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত সে শান্তি পাচ্ছে না। কিন্তু এখনও সেই স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে।

সমুদ্রতল শুষ্ক পৃথিবীর মত স্পষ্ট নয়। ঘোলাটে জলের মধ্যে চারদিকে নানারকম জলীয় উদ্ভিদের আড়ালে কোথায় যে জীম্‌স মীরার আবাসস্থান খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়।

অনেক সন্ধান করার পর বনহুর হঠাৎ তার পরিচিত ডুবন্ত গুহাটা আবিষ্কারে সক্ষম হলো। জীম্‌স মীরা যে গুহায় আবদ্ধ রয়েছে, বনহুর তার জলযান নিয়ে কৌশলে প্রবেশ করলো সেই গুহার মুখে। তারপর মেশিনে চাপ দিতেই সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো। বনহুর জলযান রেখে সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো।

অল্পক্ষণে বনহুর জীম্‌স মীরার গুহায় প্রবেশ করলো বটে কিন্তু কোথায় জীম্‌স মীরা। বনহুর পর পর সবগুলো গুহা সন্ধান করে ফিরলো, নাম ধরে ডাকতে লাগলো—জীম্‌স মীরা! জীম্‌স মীরা—তুমি কোথায়?

কিন্তু কোনো জবাব এলো না।

বনহুর চিন্তিত হয়ে পড়লো। সাবমেরিনে যে পোশাক পরেছিল সে পোশাক খুলে ফেললো বনহুর। ভিতরে অক্সিজেন দিয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গুহাগুলো তৈরি কাজেই বনহুরের কোন অসুবিধা হলো না।

বনহুর গুহা-সংলগ্ন বাথরুমে প্রবেশ করলো। হঠাৎ নজরে পড়লো, জীম্‌স মীরার সংজ্ঞাহীন দেহ পড়ে আছে বাথরুমের মেঝেতে।

বনহুর তাড়াতাড়ি জীম্‌স মীরার হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে পালস্ পরীক্ষা করে দেখলো—না, তার তেমন কিছু হয়নি। বুঝতে পারলো ভয়ে বা আতঙ্কে তার এ অবস্থা হয়েছে।

এবার বনহুর জীম্‌স মীরার সংজ্ঞাহীন দেহটা হাতের উপরে তুলে নিল তারপর নিয়ে এলো নিজের গুহায়। শয্যায় শুইয়ে দিলো যত্নসহকারে। গুহার মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা ছিল। আলোতে বনহুর দেখলো জীম্‌স মীরার কপালে একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। পড়ে গিয়ে মেঝের পাথরে আঘাত লেগে ক্ষতটা হয়েছে নিশ্চয়ই।

বনহুর একটা রুমাল দিয়ে কপালটা বেঁধে দিলো যত্ন করে। কিছুক্ষণ পর অবশ্য জ্ঞান ফিরে এলো জীম্‌স মীরার। চোখ মেলে চাইতেই বনহুরকে দেখতে পেয়ে খুশি হলো সে, চোখ দুটো আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠলো।

বনহুরের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বললো—ফিরে এসেছো তুমি? সত্যি আমি বড় দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার কি হয়েছিলো?

হেসে বললো বনহুর—ফিরে এসে তোমাকে না দেখে আমিও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। তুমি বাথরুমের মেঝেতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিলে।

আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম তাহলে?

হাঁ জীম্‌স মীরা।

জীম্‌স মীরার চোখেমুখে একটা ভীতিকর ভাব ফুটে উঠলো, বললো সে—কি ভয়ঙ্কর গর্জন! আমার মনে হচ্ছিলো চারদিক থেকে হাজার হাজার রাক্ষস ছুটে আসছে আমাকে গ্রাস করতে তাই আমি সহ্য করতে পারিনি।

জীম্‌স মীরা তুমি শুনে খুশি হবে আমি জলদানবটাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি।

কথাটা শুনামাত্র জীম্‌স মীরা আনন্দে উচ্ছল হয়ে জড়িয়ে ধরলো বনহুরের গলা, বনহুরের গণ্ডে চুম্বন দিয়ে বললো—সত্যি তুমি বীর পুরুষ।

বনহুর জীম্‌স মীরার এই আচরণে একটু বিব্রত বোধ করলো। কিন্তু পারলো না সে জীম্‌স মীরার হাত দু'খানাকে খুলে দিতে নিজের কণ্ঠ থেকে, বরং বনহুরের বাহু দুটি জীম্‌স মীরার কোমল দেহটাকে গভীর আলিঙ্গনে টেনে নিলো কাছে। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। বনহুর জীম্‌স মীরাকে বাহুমুক্ত করে দিয়ে বললো—জীম্‌স মীরা, এখানে বিলম্ব করা যায় না, এবার চলো তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বাবার কথা মনে হতেই জীম্‌স মীরার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। একটা করুণ বিষণ্ন ভাব নেমে এলো তার মুখে, বললো জীম্‌স মীরা—আমার বাবা কি এতোদিন বেঁচে আছেন। নিশ্চয়ই তিনি মারা গেছেন। যা অত্যাচার করেছিলো ওরা বাবার উপর।

বনহুর জীম্‌স মীরাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—মিছামিছি মন খারাপ করছো মীরা, তোমার বাবা নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। আমি তোমার বাবার সন্ধান করে তাঁকে খুঁজে বের করবো এবং তাঁর নিকট তোমাকে পৌঁছে দেবো।

জীম্‌স মীরা মাথা নিচু করে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—দাঁড়াও আমি তোমাকে রত্নদ্বীপের একটা ম্যাপ এনে দিচ্ছি, এতে তোমার সুবিধা হতে পারে।

বনহুর খুশি হলো, এ ধরনের একটা ম্যাপ পেলে তার পক্ষে সুবিধা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জীম্‌স মীরা জ্যাম্‌স বাবার গুপ্ত গুহায় প্রবেশ করলো, তারপর একটা পাথর সরিয়ে ফেললো।

বনহুরও গিয়েছিলো জীম্‌স মীরার সঙ্গে। অবাক হয়ে দেখলো—জীম্‌স মীরা গুহার পাথরে চাকার মত একটা কিছুতে চাপ দিতেই একটা পাথর সরে গেলো, ভিতরে সুন্দর একটি সুড়ঙ্গপথ।

জীম্‌স মীরা বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর বিনা দ্বিধায় তার সঙ্গে সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো। বনহুর আরও বেশি অবাক হলো সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করতেই পাথরের দেয়ালটা বন্ধ হয়ে গেলো আপনা আপনি। আরও লক্ষ্য করলো সে, সুড়ঙ্গমধ্যে সুন্দর আলো আর অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে।

বনহুর জীম্‌স মীরার পিছনে পিছনে এগিয়ে চললো বটে কিন্তু দৃষ্টি তার চারদিকে ঘুরে ফিরতে লাগলো—একি অদ্ভুত কাণ্ড! গভীর সাগরগর্ভে এত সুন্দরভাবে কি করে আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল জ্যাম্‌স বাবা?

জীম্‌স মীরা বনহুরের বিস্মিত ভাব লক্ষ্য করে হেসে বললো —এসব দেখে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছো, তাই না?

হ্যাঁ মীরা, তোমার জ্যাম্‌স বাবার অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশল দেখে আমি সত্যি অবাক হচ্ছি, গভীর সাগরতলে কি করে সে এমনভাবে বৈদ্যুতিক আলো আর সুন্দর হাওয়ার সৃষ্টি করেছে।

জীম্‌স চলতে চলতে থেমে পড়লো, তারপর বললো—ঐ শয়তান জ্যাম্‌স যেমন শক্তিতে ভয়ঙ্কর ছিলো তেমনি বুদ্ধিতে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সে গভীর সাগরতলে—তার এই গুপ্ত আবাস স্থল তৈরি করে নিয়েছে। পৃথিবীর লোক যেন তার সন্ধান না পায়। ম্যানচেষ্টার ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টোরেজ কর্তৃক প্রস্তুত ডায়নামার সাহায্যে সে এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে সেই অদ্ভুত ডায়নামাটাও দেখাবো।

জীম্‌স মীরার কথায় বনহুর অত্যন্ত খুশি হলো।

জীম্‌স মীরা এবার আরও কিছুটা এগিয়ে গেলো। সম্মুখে একটি গোলাকার বল ঝুলছে সেই বলটার দিকে তাকিয়ে বললো জীম্‌স—ফ্রেণ্ড, এটা হলো একটা চাবি। এই বল ধরে খুব জোরে টান দিলে ছাদের পাথর

সরে যাবে, বেরিয়ে আসবে একটি সিঁড়ি পথ। সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলে একটি ক্ষুদ্র গুহা আছে—তারই মধ্যে আছে সেই রত্নদ্বীপের ম্যাপ—যে ম্যাপখানা আমার বাবার নিকট থেকে সে সব শুনে তৈরি করে নিয়েছিলো।

বনহুর কিছু বলার পূর্বেই জীম্‌স মীরা সম্মুখস্থ ঝুলন্ত বলটা ধরে খুব জোরে টান দিলো। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে নেমে এলো একটি ঝুলন্ত সিঁড়িপথ।

জীম্‌স মীরার পিছনে বনহুর যেমন সেই ঝুলন্ত সিঁড়িপথে পা রাখতে যাবে অমনি আড়াল থেকে কে যেন আচম্বিতে লাফিয়ে পড়লো বনহুরের ঘাড়ের উপর। অমনি বনহুর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে। জীম্‌স মীরা ঝুলন্ত সিঁড়ি থেকেই ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠলো—জ্যাম্‌স বাবা।

বনহুর পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়াতে গেলো, কিন্তু ততক্ষণে দু'খানা ভয়ঙ্কর হাত তার গলা টিপে ধরেছে। বনহুর দেখলো এ যে তার হস্তে নিহত জ্যাম্‌স বাবা। তবে জ্যাম্‌স বাবার মৃত্যু ঘটেনি তার ছোরার আঘাতে?

জ্যাম্‌স বাবার হাতের চাপে বনহুর চোখে সর্ষে ফুল দেখলেও আরও নজরে ছিলো জ্যাম্‌স বাবার বুকের জামাটার দক্ষিণ অংশে জমটো রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে! চোখ দুটো শার্দুলের চোখের মত হিংস্র, আগুনের মত জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

বনহুর প্রস্তুত ছিলো না, তাই জ্যাম্‌স বাবা তাকে ভীষণভাবে কাবু করে ফেলতে সক্ষম হলো। বনহুর এবং জীম্‌স জানতো এই অদ্ভুত ডুবন্ত গুহায় এখন তারাই দু'টি প্রাণী মাত্র রয়েছে। বনহুর সবাইকে এক এক করে হত্যা করেছে নিজের হাতে—তাই সে ছিলো নিশ্চিন্ত। কিন্তু বনহুর যদি সেই গুহায় পরে প্রবেশ করতো তাহলে দেখতে পেত জ্যাম্‌স বাবার মৃতদেহটা সেই স্থানে নেই।

বনহুর মরিয়া হয়ে নিজকে রক্ষা করা চেষ্টা করতে লাগলো। একবার পকেটে হাত দিতে পারলে সে তার ক্ষুদে পিস্তলটা বের করে নিতে পারতো। তাহলে সে দেখে নিত জ্যাম্‌স রাক্ষসটাকে। বনহুরের খেয়াল আছে, ছোরাখানা সমূলে বিদ্ধ হয়েছিল তার ডান পাশের পাঁজরে। কিন্তু কি করে তার জীবন রক্ষা পেল। জ্যাম্‌স বাবার বুকের সেই রক্তস্রোত এখনও স্পষ্ট

চোখের সামনে ভাসছে। সেই তীব্র আর্তনাদের শব্দ শুনতে পাচ্ছে কানের কাছে-------আঃ আঃ উঃ------

জ্যাম্‌স বাবা যখন বনহুরের গলা দু'হাতে চেপে ধরলো তখন তার চোখ দুটো ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে যেন। বনহুর নিজের হাত দু'খানা দিয়ে লৌহ সাঁড়াশীর মত জ্যাম্‌স বাবার হাত দু'খানা ছাড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করলো। এত শক্তি জ্যাম্‌স বাবার আগে বুঝতে পারেনি বনহুর। নিচে পড়ে সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো, কোনো ক্রমে একবার দাঁড়াতে পারলেই হয়।

বনহুরকে যখন জ্যাম্‌স বাবা আচমকা আক্রমণ করে বসেছিল তখন জীম্‌স মীরা ভীষণভাবে চমকে উঠেছিলো, সে ভাবতেও পারেনি জ্যামস বাবা জীবিত আছে বা ছিলো। ভূত দেখার মতই আরষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

প্রথমে কোন কথাই জীম্‌স মীরার মুখ দিয়ে বের হলো না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো ঝুলন্ত সিঁড়িটার উপর। সম্বিৎহারার মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো সব। এবার হুশ হলো—সর্বনাশ! জ্যাম্‌স বাবা তো তার বন্ধুকে হত্যা করে ফেললো এখন উপায়!

জীম্‌স মুহূর্ত বিলম্ব না করে ওদিকে পড়ে থাকা একটা লৌহ রড দিয়ে ভীষণ জোরে তার মাথায় আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাম্‌স বাবার হাত দু'খানা অবশ হয়ে ছিলো। দেহটা ঢলে পড়লো বনহুরের পাশে।

বনহুর দ্রুত উঠে দাঁড়ালো, এবং পকেট থেকে বের করে নিলো তার ক্ষুদে মারাত্মক আগ্নেয় অস্ত্রখানা। বনহুর ভেবেছিলো, সঙ্গে সঙ্গে জ্যাম্‌স উঠে আবার তাকে আক্রমণ করবে কিন্তু করলো না। কারণ জ্যাম্‌স লৌহ রডের আঘাতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো।

জীম্‌স মীরার হস্তে তখনও লৌহ রডখানা ধরা রয়েছে। সে জ্যামস্ বাবার মাথায় পুনরায় আঘাত করার জন্য লৌহ রডটা উঁচু করতেই বনহুর ধরে ফেললো।

জীমস্ মীরা অবাক হয়ে তাকালো, বললো—ওকে শেষ করতে দাও!

বনহুর বললো—না।

কেন?

ওর বুকে ছোরা বসিয়ে আমি ভুল করেছিলাম জীম্‌স। ভাগ্যিস ওর মৃত্যু হয়নি।

বনহুরের কথায় জীম্‌স মীরার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। স্থির দৃষ্টি মেলে তাকায় সে বনহুরের মুখের দিকে।

বুঝতে পারে বনহুর জীম্‌স মীরার মনোভাব বলে—জ্যাম্‌স বাবাকে আমার নিতান্ত প্রয়োজন।

জীম্‌স আংগুল দিয়ে ভুলুণ্ঠিত জ্যাম্‌স বাবাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে—ফ্রেণ্ড তুমি ঐ শয়তানটাকে প্রয়োজন মনে করছো?

হ্যাঁ জীম্‌স।

কিন্তু সে তোমাকে হত্যা করার জন্য ভীষণ উদ্‌গ্রীব এটা তুমি ভুলে গেছো?

মোটেই না।

তবুও ওকে তোমার প্রয়োজন?

হ্যাঁ। জীম্‌স ওর জ্ঞান ফিরতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। তুমি এক কাজ করো শীঘ্র ঝুলন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাও এবং রত্নদ্বীপের ম্যাপখানা নিয়ে এসো। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

জীম্‌স মুহূর্ত বিলম্ব না করে উপরে উঠে যায়।

বনহুর লক্ষ্য করতে লাগলো ভূপতিত জ্যাম্‌স বাবাকে—কি ভয়ঙ্কর আর বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। বুকের পাশে ক্ষত দিয়ে তখনও রক্ত ঝরছে। বনহুর বুঝতে পারে, তার ছোরাখানা জ্যাম্‌সের বুকে বিদ্ধ হলেও তার হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসে আঘাত লাগেনি বা পাঁজরের কোন হাড় ফেটে যায়নি। বিশাল দেহের মাংসপেশীটাই ভেদ করে গিয়েছিলো মাত্র।

বনহুর জ্যাম্‌সের মাথায় লৌহ রডের আঘাতটার পাশে হাত দিয়ে দেখলো মাথায় অনেক বড় একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। বনহুর দক্ষিণ হস্তে পিস্তল ঠিক রেখে বাম হস্তে জ্যামের মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

কিন্তু মাথার আঘাতটা অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় সহসা জ্যাম্‌সের জ্ঞান ফিরে আসবে বলে মনে হলো না তার। উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো বনহুর।

অল্পক্ষণ পর ফিরে এলো জীম্‌স মীরা, হাতে তার একখানা চামড়ার প্যাকেট। বনহুরের হাতে প্যাকেটটা গুঁজে দিয়ে বললো জীম্‌স মীরা—ফ্রেণ্ড তুমি শীঘ্র এটা দেখে নাও ওর জ্ঞান ফিরার পূর্বেই আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে।

বনহুর জীম্‌স মীরার হাত থেকে চামড়ার প্যাকেটটা নিয়ে বললো—ওকেও যে সঙ্গে নিতে হবে জীম্‌স।

বলো কি। জীম্‌স মীরা যেন কেঁপে উঠলো বেতসপত্রের মত থরথর করে।

বনহুর ম্যাপখানা পকেট থেকে বের করে মেলে ধরলো, চামড়ার উপরে জমকালো কালি দিয়ে সুন্দরভাবে ম্যাপখানা আঁকা রয়েছে।

জীম্‌স বুঝিয়ে দিলো—সমুদ্রতলে কোন্ পথে কোন্‌দিকে গেলে ইরান সাগর পাওয়া যাবে। ম্যাপে সব স্পষ্টভাবে আঁকা আছে কাজেই কোন অসুবিধা হবে না।

বনহুর কিছুক্ষণ মনোযোগ সহকারে ম্যাপটা দেখে নেয়, তারপর বলে—যতক্ষণ জ্যাম্‌সের সংজ্ঞা ফিরে না আসে ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

অভিমান এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো জীম্‌স—তুমি বড্ড বুদ্ধিহীনের মত কথা বলছো বন্ধু। জ্যাম্‌স বাবার জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় তোমাকে আক্রমণ করবে।

কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ দেবো না জীম্‌স।

তাতো বুঝলাম, তোমার পিস্তল তাকে হত্যা করার পূর্বে সে অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারে। তার চেয়ে বলো, আমি ওকে শেষ করে দেই?---

এমন সময় নড়ে উঠলো জ্যাম্‌স বাবা।

বনহুর তার দেহ থেকে সব কিছু অস্ত্র সার্চ করে নিয়েছিলো, জ্যাম্‌স উঠে বসতেই তার বুকের কাছে পিস্তল চেপে ধরে বললো —কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হয়ে বসে থাকে।

জ্যাম্‌স ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো একবার বনহুরের মুখে।

বনহুর বললো—কোনোরকম শয়তানি করলে তোমাকে এবার সত্য সত্য মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমার পিস্তলে পাঁচ পাঁচটি গুলী আছে। আমি তোমাকে পাঁচটি গুলীই উপহার দেবো।

জ্যাম্‌স দক্ষিণ হাত দিয়ে নিজের মাথাটা একবার নেড়ে নিল হয়তো বা জ্যাম্‌স মীরার লৌহ রডের আঘাতটা টন্‌টন্‌ করছিলো। হাত বুলিয়ে ব্যথাটাকে হাল্‌কা করে নেবার চেষ্টা করলো বোধ হয় সে।

জীম্‌স মীরার মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। জ্যাম্‌স বাবা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একবার তাকালো জীম্‌সের দিকে। মনোভাব—তোমার জন্যই আজ আমার সর্বনাশ হয়েছে।

বনহুর ওকে বেশিক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগ না দিয়ে বললো—উঠো এবার!

বিরাট গরিলা দেহের মত গড়িয়ে গড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো জ্যাম্‌স বাবা! মুখোভাব ক্রোধান্ধ হলেও ব্যথাকাতরও বটে। বনহুরের ছোরা তার হৃৎপিণ্ড ছেঁদ না করলেও আঘাতটা কম ছিলো না। এখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছে জমাটবাঁধা রক্তের গা বেয়ে বেয়ে! উঠে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলো জ্যাম্‌স বাবা।

বনহুর কঠিন কণ্ঠে বললো—চলতে পারবে এখন?

অগ্নিগোলার মত চোখ দুটো তুলে তাকালো জ্যাম্‌স বাবা বনহুরের মুখের দিকে। কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর এক মুহূর্তের জন্যও ক্ষুদে পিস্তলখানাকে তার বুকের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়নি। পিস্তল ঠিক রেখে সে কথা বলছিলো; কারণ বনহুর জানে, জ্যাম্‌স বাবা কতখানি সাংঘাতিক আর অসুরের মত শক্তিবান। জীম্‌স মীরা না থাকলে আজ তাকে হয়তো হত্যা না করে ছাড়তো না এই শয়তানটা।

যাক্ বেশিক্ষণ কিছু ভাবার সময় নেই এখন, বনহুর পিস্তল জ্যাম্‌স বাবার বুকে চেপে ধরে বলে—চলো আমার সঙ্গে।

জ্যাম্‌স এবার কথা বললো—কোথায় যাবো?

রত্নদ্বীপে। বললো বনহুর।

জ্যাম্‌স বাবার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিলো। তারপর যেন ছাই বর্ণ হয়ে গেলো, বললো— রত্নদ্বীপের সন্ধান তোমাকে কে বললো?

জীমস মীরা যদিও জ্যাম্স বাবাকে ভীষণ ভয় করছিলো কিন্তু এক্ষণে সে যেন সাহসী হয়ে উঠলো, বললো—আমি—আমিই ওকে রত্নদ্বীপের সন্ধান বলেছি—শুধু তাই নয়, ঐ দেখো ওর বাম হস্তে তাকিয়ে রত্নদ্বীপের ম্যাপখানাও আমি ওকে দিয়েছি।

জ্যামস বাবা বনহুরের হাতের দিকে তাকাতেই তার মুখ বিকৃত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো, ভুলে গেলো পিস্তলের কথা সে বনহুরের হাত থেকে ম্যাপখানা কেড়ে নিতে যাচ্ছিলো।

বনহুর দৃঢ়কণ্ঠে বললো—ভুলে যেও না জ্যাম্স তোমার বুকের কাছে যমদূত রয়েছে।

সত্যিই জ্যাম্স বিস্মৃত হয়েছিলো পিস্তলের কথাটা, ঝুঁকে সে হাত বাড়াতে যাচ্ছিলো বনহুরের বাম হস্তের দিকে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলো জ্যাম্স তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

বনহুর বললো— রত্নাদ্বীপে পৌঁছে রত্নদ্বীপের ম্যাপখানা তোমাকে ফেরৎ দেবো জ্যাম্স ভয় পেও না।

জ্যামস রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

বনহুর বললো— চলো আমার সঙ্গে।

পিস্তলের সম্মুখভাগ দিয়ে জ্যামসের বুকে ঠেলা দিয়ে তার মুখখানা গুহার দরজার দিকে ফিরিয়ে নিলো তারপর পিস্তলখানা ওর পিঠে চেপে ধরে বললো—পা চালাও।

জ্যাম্স অগ্রসর হলো।

বনহুর বললো—এস জীম্স।

বনহুর জ্যাম্স বাবা ও জীম্স মীরাসহ ডুবন্ত পাহাড়ের শেষ গুহার মুখে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর নিজে ডুবুরী ড্রেস পরে নিলো এবং মীরাকে পরার জন্য নির্দেশ দিলো। জ্যাম্স বাবাকেও পরিয়ে দিলো তার জলযান চালকের অদ্ভুত ড্রেস।

এবার বনহুর জ্যাম্স বাবা ও জীম্স মীরাসহ গোলাকার জন্তু আকার জলযানটার মধ্যে চেপে বসলো। কিন্তু বনহুর কোনো সময়ের জন্যও জ্যামস বাবার পিঠ থেকে পিস্তলটা সরিয়ে নিলো না।

জ্যাম্‌সকে জলযানের ড্রাইভ আসনে বসিয়ে বনহুর নিজে বসলো তার পাশে। জীম্‌স মীরা পিছনের আসনে বসলো। বনহুরের পিস্তল তখনও জ্যাম্‌স বাবার পাঁজরে চেপে আছে শক্ত হয়ে। বনহুরের বাম হস্তের ম্যাপে ঝাম ম্যাপ সাগর থেকে ইরান সাগরের পথের নির্দেশ দেওয়া আছে; আরও আছে সাগরতলে রত্নদ্বীপের অবস্থান চিহ্ন।

জ্যাম্‌স বাবা অগত্য জলযানটার মেশিন স্টার্ট দিল। গভীর জলের তলায় বিকট একটা শব্দ করে তীরবেগে ছুটলো জলযানটা।

বনহুর এক মুহূর্তের জন্য জ্যাম্‌স বাবার পাঁজর থেকে ভুলক্রমেও পিস্তল সরিয়ে নিল না। দৃষ্টি রইলো তার হাতের দিকে সর্বক্ষণ।

জীম্‌স মীরাও নিপুণ দৃষ্টি রেখেছে জ্যাম্‌স বাবার দিকে।

জলযান তীরবেগে ছুটে চলেছে।

বনহুর শুধু জ্যাম্‌স বাবার উপরই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে তা নয়, অদ্ভুত গোলাকার জন্তুর মত জলযানটি কিভাবে সে চালনা করছে সেটাও বনহুর সূক্ষ্মভাবে দেখে নিচ্ছিলো।

বনহুরের বাম উরুর উপরে ঝাম সাগর হতে ইরান সাগরে যাওয়ার পথ নির্দেশের ম্যাপখানা মোলানো অবস্থায় রয়েছে। জলযানটার ভিতরে সম্মুখভাবে মিটার এবং দিকদর্শন যন্ত্র আঁটা রয়েছে। জ্যাম্‌স বাবা ভুলপথে চালনা করলেই ধরা পড়ে যাবে সে বনহুরের হাতে।

বনহুর সাবধান করে দিচ্ছে মাঝে মাঝে—খবরদার একটু পথ ভুল করেছো অমনি মরেছো মনে রাখবে।

জ্যাম্‌স কত ভাগ্যে তার হারানো জীবনটা ফিরে পেয়েছে কাজেই সে সহসা জলযানটা ভুলপথে নিয়ে যেতে সাহসী হচ্ছিলো না! কিন্তু অত্যন্ত রক্তক্ষয়ে ক্রমান্বয়ে জ্যাম্‌স ঝিমিয়ে পড়ছিলো।

জীম্‌স মীরা বুঝতে না পারলেও বুঝতে পেরেছিল বনহুর, সে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারছিলো না জ্যাম্‌স বাবার উপর। কারণ যে কোনো মুহূর্তে জ্যাম্‌সের হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে জলযানটা চলৎশক্তি রোহিত হয়ে পড়বে কিংবা কোন ডুবন্ত পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। জ্যাম্‌সের সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে তাদেরও।

বনহুর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো জ্যাম্‌স বাবাকে ইরান সাগরে পৌঁছানো পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে।

জ্যাম্‌স বাবার হাত দু'খানা ক্রমান্বয়ে নেতিয়ে আসছে যেন সত্যি ওর কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছে বনহুর। জলযানটা ঘণ্টায় কমপক্ষে পাঁচশত মাইল স্পীডে ছুটে চলেছে কিন্তু তবুও পুরো তিন-চার ঘণ্টায় ঝাম সাগর অতিক্রম করতে সক্ষম হলো না।

বনহুর বার বার তার হাতঘড়িটা দেখে নিচ্ছিলো।

জ্যাম্‌স ঠিক পথেই চলেছে বুঝতে পারলো বনহুর আর জীম্‌স মীরা। কারণ মাঝে মাঝে বনহুর আর জীম্‌স মীরা ম্যাপখানা দেখে নিচ্ছিলো।

কয়েক ঘণ্টা পর জ্যাম্‌স বনহুর আর জীম্‌স মীরাকে নিয়ে অদ্ভুত জলযানটা ইরান সাগরে পৌঁছল।

ভয়ঙ্কর জ্যাম্‌স বাবা এতোক্ষণ কোনরকম উক্তি উচ্চারণ করেনি, এবার সে বললো—রত্নদ্বীপের ম্যাপখানা আমাকে দিয়ে দাও।

বনহুর তার পিস্তল তখনও জ্যাম্‌সের পাঁজরে চেপে ধরে ছিল, বললো—বলেছি তো রত্নদ্বীপে পৌঁছেই দিয়ে দেবো।

আমি বিশ্বাস করি না তোমাকে। বললো জ্যাম্‌স।

চলো বন্ধু রত্নদ্বীপে গিয়ে তারপর তুমি তোমার ম্যাপ ফিরে পাবে। কথার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের চাপ দেয় সে জ্যাম্‌সের পাঁজরে।

জ্যাম্‌স সজাগ হবার চেষ্টা করে।

কিন্তু আর বেশিক্ষণ জ্যাম্‌স জীবিত থাকবে বলে মনে হচ্ছে না, কারণ তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে হয়ে আসছিল। পিস্তলের দ্বারা ভয় দেখিয়ে তাকে জলযান চালনায় বাধ্য করলেও মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

বনহুর বললো—ইরান সাগরে পৌঁছতে আর কতক্ষণ লাগবে জ্যাম্‌স?

জ্যাম্‌স বললো—পথ আর বেশি নেই, তবে আমি যেন কেমন অসুস্থ বোধ করছি। তোমাকে ইরান সাগরে পৌছে দিতে পারবো কিনা সন্দেহ---জ্যাম্‌স হ্যাণ্ডেলের উপর মাথাটা রাখলো।

বনহুর বিপদ গণলো, সর্বনাশ হবে তাহলে। জ্যাম্‌স বাবার মৃত্যু হলেও জলযানটা বিক্ষিপ্তভাবে যে কোন দিকে ছুটে যাবে কোন ডুবন্ত পাথরে বা পাহাড়ে আঘাত লেগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বনহুর শত চেষ্টা করেও জ্যাম্‌স বাবাকে আর জীবিত রাখতে সক্ষম হলো না। জ্যাম্‌স বাবা কাৎ হয়ে পড়ে গেলো হ্যাণ্ডেলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর জ্যাম্‌সের দেহটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরলো।

জলযানটা এক মুহূর্তের জন্য ঘুরপাক খেল গভীর জলের মধ্যে। জীম্‌স ভয়ার্তভাবে চিৎকার করে উঠলো—বন্ধু, একি হলো! এখন উপায়?

বনহুর সান্ত্বনা দিয়ে বললো—জীম্‌স ভয় পেও না, চুপ করে বসে থাকো, নিশ্চয়ই আমি জলযানটা চালিয়ে নিতে সক্ষম হবো।

এতোক্ষণ বনহুর ভালভাবে জ্যাম্‌সের চালনা লক্ষ্য করেছিল। যদিও জলযানটা ঠিক সাবমেরিনের মত নয় কিন্তু এর মেশিনপত্র প্রায় একই রকম। বুদ্ধিমান বনহুর জ্যাম্‌স বাবার মতই জলযানটা চালনা করতে লাগলো।

জলযানটা ভীষণভাবে একটা পাক খেয়ে মাতালের মত বেখেয়ালীভাবে ছুটতে লাগলো। বনহুর হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে স্পীড কমিয়ে দিল। অনেক ধীরে চলতে লাগলো এবার জলযানটা।

জ্যাম্‌স বাবার বিরাট বাপুটা চালক আসনে কাৎ হয়ে থাকায় বনহুরের অসুবিধা হচ্ছিলো। বনহুর জলযানটা সম্পূর্ণ থামিয়ে ফেললো।

জীম্‌স বললো—কি করবে তুমি?

হতভাগ্য জ্যাম্‌সকে জলযান থেকে সরিয়ে ফেলবো।

ঠিক, সেই ভাল হবে। বললো জীম্‌স মীরা।

বনহুর জলযানের কপাট খুলে ফেললো, তারপর জ্যাম্‌সের বিশাল দেহটা টেনে ফেলে দিলো সমুদ্রজলের মধ্যে। বললো বনহুর—জ্যাম্‌স বাবা শেষ পর্যন্ত মরলো এবার! যাক, আমরা এখন ইরান সাগরে এসে গেছি।

জ্যাম্‌সের লাশটা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে মেশিনে চাপ দিতেই সমুদ্রের যে পানি জলযানে প্রবেশ করেছিল বেরিয়ে গেলো , ঢাকনা বা দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো আপনাআপনি।

এবার বনহুর আর জীম্‌স মীরা বসলো পাশাপাশি। জীম্‌স মীরার উরুর উপর মেলানো রয়েছে রত্নদ্বীপের পথ-নির্দেশ ম্যাপখানা।

বনহুর জ্যাম্‌সের অনুকরণে জলযানটা চালনা করে চলেছে। দিকদর্শন যন্ত্রের সাহায্যে পথ চিনে নিচ্ছিলো। এখন যে স্থানে তারা পৌঁছেছে এখানে থেকে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে হলো ইরান সাগর এবং রত্নদ্বীপ।

বনহুর দিকদর্শন যন্ত্রে লক্ষ্য রেখে ভালভাবে জলযানটা চালনা করতে লাগলো। তবে জ্যাম্‌স যেমন স্পীডে চালিয়ে যাচ্ছিলো তেমন স্পীডে বনহুর চালাতে না পারলেও বেশ দ্রুত বেগেই ইরান সাগর অতিক্রম করে চললো।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বনহুর জীম্‌সসহ ইরান সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এসে পৌঁছে গেলো । এবার তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ডুবন্ত পাহাড়ের অনতিদূরে পৌছতে সক্ষম হলো।

কিনতু রত্নদ্বীপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়লো।

বনহুর জলযানটা এবার থামিয়ে ম্যাপটা নিজের চোখের সামনে মেলে ধরলো। জীম্‌স মীরাও দেখতে লাগলো তার সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে।

রত্নদ্বীপ খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়, তদুপরি শুকনো মাটির উপর নয়— গভীর জলের তলায়।

বনহুর আর জীম্‌স মীরা জলযান নিয়ে ডুবন্ত পাহাড়ের চারপাশ দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো।

❑

ঝাম শহর ত্যাগ করে 'শাহী' জাহাজ এবার ফিরে চললো কান্দাই অভিমুখে। জাহাজে সম্মুখভাগে শোকের চিহ্নস্বরূপ কালো পতাকা উড়ছে।

রহমান আর মাহবুব বিষণ্ন মনে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পতাকার নিচে রেলিং-এর ধারে। জাহাজের প্রত্যেকের মুখেই বিষাদের ছায়া। রহমান গভীর কণ্ঠে বললো—শেষ পর্যন্ত সর্দারকে হারিয়ে তবে ফিরে যেতে হলো। কিন্তু ফিরে গিয়ে কি জবাব দেবো সকলের কাছে— রহমানের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

জাহাজের প্রত্যেকেই শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

কিউকিলা নিহত হলো, ঝামবাসী আশু বিপদ হতে উদ্ধার পেল। কিন্তু কেউ অন্তর দিয়ে খুশি হতে পারলো না। ঝামসর্দার এবং রাজা মোহন্ত সিন্ধু পর্যন্ত নিরানন্দময় হয়ে রইলেন।

ঝাম শহরবাসীদের মনেও সম্পূর্ণ আনন্দ নেই। যদিও তারা কিউকিলা নিহত হওয়ায় খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল কিন্তু যখন জানতে পেরেছিল কিউকিলার নিহতকারীও সাগর তলে নিরুদ্দেশ হয়েছে তখন তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিলো। এমনকি অনেকেই অশ্রুবিসর্জন করেছিলো।

'শাহী' জাহাজ নিয়ে রহমান প্রায় দু'সপ্তাহ্ অপেক্ষা করার পর ফিরে চলেছে; হঠাৎ যদি নূরী এসে পড়ে তাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব হবে না।

বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে রহমান। তার মনে কত রকম প্রশ্ন জাগছে। না জানি আজ সর্দারের দেহটা কোথায় তলিয়ে গেছে—হাঙ্গর-কুমীরের পেটে চলে গেছে হয়তো। কথাটা স্মরণ হতেই শিউরে উঠে রহমান।

এমন সময় একজন চিৎকার করে উঠলো—ছোট সরদার দেখুন দেখুন ঐ যে একটা লাশ ভেসে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

চমকে উঠলো রহমান, তাকালো দূরে—সত্যি একটা কি যেন ঢেউ-এর উপর দোল খেয়ে খেয়ে ভেসে চলেছে। অন্যান্য সকলেই দেখতে লাগলো। সবাই একবাক্যে বললো, ওটা কোন মৃতদেহ ছাড়া কিছু নয়।

রহমান বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখলো এবং বিস্মিত হলো মৃতদেহের পরনে রয়েছে ডুবুরী ড্রেস। বিরাট আকার লাগছে লাশটা তবে কি পঁচে ফুলে অমন হয়ে গেছে।

রহমান নিজেকে সংযত করে নিল—সে বুঝতে পারলো ওটাই তাদের সর্দারের মৃতদেহ। তখনই 'শাহী' থেকে বোর্ট নামানো হলো। অন্যান্য কয়েকজন অনুচরসহ রহমান নেমে পড়লো বোট নিয়ে সমুদ্রবক্ষে।

'শাহী' তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

রহমানের বুকটা ভীষণভাবে ধক্ ধক্ করছে—নাজানি সর্দারের মুখখানাকে সে কি অবস্থায় দেখতে পাবে। হাতুড়ি দিয়ে কেউ যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকে থেতলে দিচ্ছিলো।

বোট নিয়ে কয়েকজন অনুচরসহ রহমান মৃতদেহটার নিকটে পৌঁছে গেলো । নিকটে পৌঁছে অবাক হলো সবাই—দেহটা প্রায় তেলের পিঁপের মত ফোলা লাগছে।

অন্যান্য অনুচরের সাহায্য নিয়ে রহমান মৃতদেহটাকে বোটে উঠিয়ে নিল। এটাই যে তাদের সর্দারের মৃতদেহ তাতে ভুল নেই, কারণ সেই ডুবুরী ড্রেস পরা রয়েছে। পোশাক মৃতদেহের সঙ্গে এঁটে বসে গেছে একেবারে।

রহমান কি করে তার সরদারকে এই বীভৎস বিকৃতরূপে দেখবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়লো, কিন্তু কোন উপায় নেই—মৃতদেহের পোশাক উন্মোচন করতেই হবে। আদেশ দিলো রহমান মাহবুবকে—মাহবুব খুলে ফেল লাশের দেহের পোশাকটা।

মৃতদেহের পোশাক খুলে ফেলার আদেশ দিয়ে নিজে মুখ ফিরিয়ে রাখলো অন্য দিকে।

কয়েকজন মিলে খুলে ফেললো লাশের মুখের অক্সিজেন পাইপসহ মুখোশটা।

মাহবুব বিস্ময়ভরা গলায় বলে উঠলো—ছোট সর্দার এ যে দেখছি হোয়াইট ম্যান। কোন ইংরেজ হবে।

মাহবুবের কথা শুনে রহমান তাড়াতাড়ি এসে লাশটার মুখে দৃষ্টি ফেলল, দেখলো সত্যি তাদের সর্দারের লাশ নয় এটা। বিরাট মোটাদেহী একটা ইংরেজ সাহেব।

রহমানের বুক থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেলো। বললো সে—কোনো হতভাগ্য ডুবুরী হবে।

মৃতদেহের পোশাক খুলে ফেললো ওরা দেখতে পেত—লাশের বুকে ছিলো একটা বিরাট ক্ষত, যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল দস্যু বনহুরের ছুরিকাঘাতে। লাশটা জ্যাম্স বাবার মৃতদেহ।

রহমান বললো—ওর দেহের পোশাক খুলে কাজ নেই ওকে সমুদ্রগর্ভে নামিয়ে দাও।

রহমানের আদেশ অনুযায়ী লাশটা পুনরায় সমুদ্রজলে ফেলে দেওয়া হলো। 'শাহী' ছাড়ার জন্য আদেশ দিলো রহমান।

কেন যেন রহমানের বুকটা হাল্‌কা লাগছে আগের চেয়ে অনেক। লাশটা প্রথম দেখার পর যতক্ষণ লাশটার মুখের আচ্ছাদন উন্মোচন করা না হয়েছিল ততক্ষণ তার হৃৎপিণ্ডটা আছাড় খাচ্ছিলো জলের মাছ ডাঙ্গায় তোলার পর যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনি। কিন্তু যখনই সে দেখলো তার সর্দারের মৃত দেহ নয় সেটা তখনই যেন একটা অনাবিল শান্তি মুছে নিলো তার বুকের জ্বালাটা।

রহমান যখন ঝাম সাগর অতিক্রম করে কান্দাই-এর পথে অগ্রসর হচ্ছে তখন হাজার হাজার মাইল দূরে ইরান সাগরতলে দস্যু বনহুর জীম্‌স মীরাসহ রত্নদ্বীপের সন্ধান করে ফিরছে।

বনহুর ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ম্যাপ দেখেও কোন হদিস পাচ্ছে না রত্নদ্বীপের। ম্যাপের নির্দেশ অনুযায়ী ঝাম সাগর থেকে ইরান সাগরে পৌঁছতে যত বেগ পেতে না হয়েছে তার চেয়ে শত শত গুণ বেগ পেতে হচ্ছে রত্নদ্বীপের সন্ধানে।

জীম্‌স বললো—ফ্রেণ্ড আর পারছি না সহ্য করতে।

বনহুরও বহুক্ষণ অক্সিজেন পাইপ পরে থাকায় বেশ অসুস্থ বোধ করছিলো তবু জীম্‌স মীরাকে বললো—একটু কষ্ট করো জীম্‌স! হয়তো এক্ষুনি রত্নদ্বীপের সন্ধান পেয়ে যাবো।

বনহুর জলযানের স্পীড কমিয়ে দিয়ে ম্যাপখানা পুনরায় মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলো। হঠাৎ আনন্দভরা কণ্ঠে বলে উঠলো—জীম্‌স পেয়েছি। রত্নদ্বীপের সন্ধান পেয়েছি। এই দেখো---ম্যাপখানার এক জায়গায় আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললো—এই যে ক্ষুদ্র একটি তারকা চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো, এটাই হলো রত্নদ্বীপ।

বনহুর এবার জলযানটার হ্যাণ্ডেল চেপে ধরলো।

ঝাম সাগরের চেয়ে ইরান সাগরের গভীরতা অনেক বেশি। জলযানের মিটারে দেখলো, তারা এখন হাজার হাজার ফুট জলের নিচে রয়েছে। যেখানে হাঙ্গর কুমীর বা কোনোরকম জলজীব নেই। এতো নিচে স্বচ্ছ পানি দেখে বনহুর বিস্মিত হলো—যেন কাকচক্ষুর মত নির্মল পানি।

বনহুর জলযান নিয়ে যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই বেশি আশ্চর্য হচ্ছে সে। গভীর জলদেশে এত সুন্দর স্বচ্ছ পানি। সব যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কোনরকম আগাছা বা জলীয় উদ্ভিদ পর্যন্ত নেই সেখানে।

বনহুর আর জীম্‌স দেখলো—দূরে, অনেক দূরে একটি মন্দিরের চূড়ার মত কিছু নজরে পড়ছে। জীম্‌স চিৎকার করে উঠলো —ফ্রেণ্ড আমরা রত্নদ্বীপের অতি নিকটে পৌঁছে গেছি। ঐ দেখো রত্নদ্বীপের চূড়া দেখা যাচ্ছে।

বনহুর দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দর একটা চূড়া ঠিক যেন সোনার মত চক্‌চক্ করছে সেটা গভীর জলের তলায়। শত শত মানিক যেন বসানো আছে চূড়াটার গায়ে।

বনহুর তার জলযান নিয়ে সেই উজ্জ্বল চূড়া লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো।

স্পীড বাড়িয়ে দিলো বনহুর এবার।

জীম্‌সের আনন্দ যেন ধরছে না আর।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের জলযানটা পৌঁছে গেলো রত্নদ্বীপের একেবারে সন্নিকটে। বিস্ময়ে বনহুরের চোখে ধাঁধা লেগে গেলো যেন। জীম্‌সের মুখে তাকিয়ে বললো বনহুর সত্যি অপূর্ব!

ফ্রেণ্ড, ভিতরটা তুমি দেখনি—আরও অপূর্ব।

বনহুর আর জীম্‌সের জলযান রত্নদ্বীপের নিকটে পৌঁছলে স্পষ্ট দেখলো—সম্মুখে একটি সুন্দর মণি-মুক্তাখচিত দরজা। কিন্তু দরজা বন্ধ রয়েছে ভিতর থেকে।

জীম্‌স যেন তার অসাড় প্রাণ ফিরে পেয়েছে, বনহুর নেমে পড়তেই সেও বেরিয়ে এলো জলযানের ভিতর থেকে। উভয়ের শরীরেই ডুবুরীদের অদ্ভুত ড্রেস থাকায় তারা বিনা দ্বিধায় জলের মধ্যে নেমে চলাফেরা করতে লাগলো।

বনহুর অবাক হয়ে দেখেছে—কি সুন্দর একটি চূড়া! আসলে ঠিক কোন মন্দিরের চূড়া নয়—একটি ডুবন্ত পাহাড়। পাহাড়ের মাথাটাকে চূড়ার মত মনে হচ্ছিলো। চূড়াটা সম্পূর্ণ সোনার তৈরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে মণিমুক্তা বসানো রয়েছে। গভীর জলের তলায় রত্নদ্বীপের চূড়াটা ঝলমল করছে!

বনহুর দরজায় চাপ দিলো কিন্তু খুলতে সক্ষম হলো না।

জীম্‌স এসে দরজার পাশে একটা ছোট্ট বোতামে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো ।

কিন্তু আশ্চর্য ভিতরেও ঠিক সোনার তৈরি দেয়াল। দেয়ালে মণি-মুক্তা বসানো। জীম্‌স বনহুরকে নিয়ে প্রবেশ করলো ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেলো । আরও অবাক হলো বনহুর—রত্নদ্বীপের মধ্যে কোনরকম জল প্রবেশ করেনি।

জীম্‌স বললো—ফ্রেণ্ড, তুমি ঐ পোশাক উন্মোচন করে ফেল।

বনহুরকে লক্ষ্য করে কথাটা বলে জীম্‌স নিজেও শরীর থেকে ডুবুরী ড্রেস খুলে ফেললো।

বনহুরও খুলে ফেললো তার নিজ দেহের পোশাক। বেশ হাল্কা ও স্বচ্ছ লাগাছে এখন।

জীম্‌স আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে বললো—এখন আমি মুক্ত কেউ আমাকে বাবার কাছে যাওয়ায় বাধা দেবে না। এসো ফ্রেণ্ড।

চলো। বললো বনহুর। তারপর জীম্‌সকে অনুসরণ করলো। চারদিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হলো বনহুর—এমন সুন্দর আর মনোরম স্থান সে জীবনে বুঝি আর দেখেনি।

পাথর খোদাই করে স্থানে স্থানে স্বর্ণমূর্তি তৈরি করা হয়েছে। মূর্তিগুলো হিন্দুদের দেবীর মূর্তি বলেই মনে হলো। গভীর সমুদ্রতলে দেবদেবীর মূর্তি-বিস্ময়কর বটে! কোথাও বা শুধু পাথরে খোদাই করা মূর্তি, কোথাও বা স্বর্ণতৈরি মূর্তি। কোন কোন মূর্তির দেহে মণি-মুক্তা খচিত রয়েছে। সর্পাকৃতি এবং মৎস্যকন্যা মূর্তিগুলোর উপরিভাগ সুন্দর নারী মুখ আর নিচের অংশ সর্পলেজ ও মৎসলেজ আকারে তৈরি করা হয়েছে।

আরও অনেক রকম মূর্তি দেখতে পেল বনহুর বড় বড় হস্তীশুঁড় বিশিষ্ট পাথরমূর্তি। কোনটা আবার ঠিক কচ্ছপ আকারের। বনহুর বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখছে আর ভাবছে, হাজার হাজার ফুট পানির নিচে কোন কারিগর এমন সুক্ষ্মভাবে পাথর কেটে এই মূর্তিগুলো তৈরি করেছে। কিন্তু কে দেবে জবাব, জীম্‌স মীরার বয়সই বা কত আর সেই বা কি জানে। বনহুর শুধু নীরবে দেখেই যেতে লাগলো।

জীম্‌স মীরা বললো—ফ্রেণ্ড, তুমি অবাক হয়ে গেছো কিন্তু আমার সঙ্গে এসো, দেখবে আরও কত সুন্দর সুন্দর মূর্তি থরে থরে সাজানো আছে।

বনহুর বললো—জীম্‌স মীরা তোমার বাবা কি মূর্তি পূজারী?

বনহুরের কথা জিভ বের করে দাঁত কামড়ে বললো—ছিঃ ছিঃ ওকথা আর দ্বিতীয় বার বলো না। আমার বাবা মূর্তিপূজারী হবেন কেন? বহুকাল পূর্বে এই রত্নদ্বীপ যার ছিলো তিনি ছিলো মূর্তি-পূজারী। বাবার কাছে শুনেছি, তিনি ছিলো ব্রাহ্মার্ষি। তারই মন্দির ছিলো এটা।

বনহুর অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলো—ব্রহ্মার্ষি! সে আবার কি রকম জাতি?

আমি বেশি জানি না তবে এটুকু জানি তিনি ছিলো ঋষি। বাবাকে তিনি খুশি হয়ে এ মন্দির দান করেছিলো।

বনহুর ঋষি বা এইরকম কোন মহাত্মাদের সম্বন্ধে বেশি অভিজ্ঞ ছিলো না তাই সে জীম্‌সের কথা নিয়ে বেশিক্ষণ না ভেবে পা বাড়ালো— চলো জীম্‌স তোমার বাবার সন্ধান করি।

জীমস আর বনহুর অগ্রসর হলো।

রত্নদ্বীপের মধ্যে যে এত সুন্দর তা আগে ভাবতে পারেনি বনহুর। দ্বীপের মধ্যে ছোট ছোট কুঠরীর মত খোপ রয়েছে। প্রত্যেকটা খোপে থরে থরে সাজানো সোনা দানা আর মনিমুক্তা।

চোখ যেন ঝলসে যায়।

বনহুরের ভাণ্ডরেও বহু সোনা দানা মণিমুক্তা, লক্ষ লক্ষ টাকার লঙ্কার রয়েছে কিন্তু এত বেশি মণিমুক্তা সে দেখেনি সত্য। চারদিক যেন আলোয় ঝলমল করছে।

জীম্‌স মীরা বনহুরসহ রত্নদ্বীপের ভিতর দিয়ে এদিকে সেদিক হয়ে কিছুদূর এগুতেই নজরে পড়লো—ওদিকে একটি পাথরখণ্ডের উপর মাথা রেখে এক বৃদ্ধ শুয়ে আছেন। তার দেহে শ্বাস আছে কিনা সন্দেহ। পরনে ছিন্ন ভিন্ন মলিন পায়জামা আর পাঞ্জাবী ধরণের পোশাক। এককালে এই পোশাকগুলো যে ঝলমল করতো তা এখনও বুঝা যায়।

জীম্‌স বৃদ্ধাকে দেখেই উচ্চঃস্বরে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—বাবা--- ছুটে গিয়ে বসে পড়লো বৃদ্ধের পাশে।'

বনহুর বুঝতে পারলো, এই বৃদ্ধই ইরানের বাদশা শাহ্ নাশাদ। অবাক হয়ে দেখলো শাহ্ নাশাদের ভয়ঙ্কর নির্মম অবস্থা।

ধীরে ধীরে শাহ নাশাদ মাথা তুললো, বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। জীম্‌স মীরাকে তিনি যেন চিনতেই পারছেন না। কোঠরাগত চোখ, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, দাড়ি গোঁফ শুভ্র হয়ে গেছে। হাত-পায়ে লৌহশিকল আঁটা। শিকলগুলো হাতে-পায়ে দাগ কেটে বসে গেছে যেন। অসহায় শুষ্ক মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছেন শাহ্ নাশাদ নিজ কন্যাকে।

জীম্‌স মীরা পিতার অবস্থা দেখে সহসা কোন কথা বলতে পারছিল না- কেন যেন কণ্ঠ টিপে ধরেছে তার। জীম্‌স মীরার গণ্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আবার সে ডাকলো—বাবা! আমার বাবা----

এতক্ষণে যেন হুশ হলো ইরান শাহের অতিকষ্টে শুষ্ক গলায় বললো—মা, মীরা।

হাঁ হাঁ, বাবা, আমি তোমার মেয়ে মীরা!

মা, মা----

বলো? বলো বাবা?

ঐ শয়তান নরপিশাচ শয়তান জ্যাম্‌স কই? বৃদ্ধ ইরান শাহের ঘোলাটে চোখ দুটোজ্বলে উঠলো যেন আগুনের গোলার মত।

জীম্‌স মীরা বললো—বাবা, তুমি নিশ্চিন্ত হও। আর জ্যাম্‌স তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

মীরা।

হাঁ বাবা। এবার তাকালো জীম্‌স মীরা বনহুরের দিকে তারপর বললো—এই যুবক আমাকে শয়তান জ্যাম্‌সের হাত থেকে রক্ষা করেছে বাবা। জ্যাম্‌াসকেও সে হত্যা করেছে।

বৃদ্ধ আনন্দে বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেললেন শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন একটি কথাও যেন তাঁর কণ্ঠ দিয়ে বের হচ্ছে না। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন ইরান শাহ্।

বনহুর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। বৃদ্ধের পাশে, দু'হাতে ধরে বললো—আপনি স্থির হন। বেশি উত্তেজিত হলে হার্টফেল করতে পারেন।

বনহুরের কথায় কান না দিয়ে বলেন ইরান শাহ—কে তুমি যুবক আমার এতোবড় উপকার করলে? বাবা, তোমার পরিচয় পেলে আমি অনেক খুশি হবো।

পরিচয় একদিন জানাবো, এখন হিতৈষী হিসাবেই আমাকে গ্রহণ করতে পারেন।

কি বলে ডাকবো তোমাকে?

আমার নাম মনির। আমাকে এই নামেই ডাকবেন, অবশ্য যতক্ষণ আপনাদের সান্নিধ্যে আছি।

ইরান শাহ তাঁর দুর্বল ক্ষীণ শিকল পরানো বাহু দু'টি দিয়ে বনহুরকে জাপটে ধরলেন—বাবা, তুমি আমার সন্তানের চেয়েও অনেক বেশি--- বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো তাঁর গলা।

বনহুর এবার ইরান শাহের চোখের অশ্রু নিজ হাতে মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। কি করে এবার ইরান শাহকে শৃঙ্খলমুক্ত করা যায় সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো বনহুর।

লৌহশিকলগুলো এমনভাবে ইরান শাহের হাতে পায়ে বসে গিয়েছিলো যে কিছুতেই কেটে বের করা সম্ভব হচ্ছিলো না।

বনহুর কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর ব্যর্থ হয়ে ভাবতে লাগলো কি করা যায়—হঠাৎ মনে পড়লো, নিশ্চয়ই জ্যাম্‌স লৌহশিকলে লাগানো তালার চাবি সঙ্গে নিয়ে যায়নি। হয়তো বা কোথাও রেখে গেছে চাবিগুলো।

জীম্‌স আর বনহুর আশে পাশে খুব ভালভাবে সন্ধান করে দেখতে লাগলো।

হঠাৎ জীম্‌স আনন্দধ্বনি করে উঠলো—ফ্রেণ্ড পেয়েছি। একতাড়া চাবি পেয়েছি।

বনহুর জীম্‌সের আনন্দধ্বনি শুনে খুশি হয়ে এগিয়ে গেলো , দেখলো সত্যিই ওদিকে একটা তাকের উপরে একতাড়া চাবি রয়েছে। চাবিগুলো মরচে ধরে গেছে একেবারে। বনহুর চাবির গোছা নিয়ে ফিরে এলো ইরান শাহের পাশে। দ্রুতহস্তে খুলে ফেললো ইরান শাহের হাত পা থেকে লৌহ শিকলগুলো।

শিকলমুক্ত হয়ে বৃদ্ধ ইরান শাহ হু হু করে কেঁদে উঠলেন, হাত দিয়ে বন্ধন স্থানের ক্ষতগুলো নাড়তে লাগলেন তিনি।

মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল ইরান শাহ পুনরায় তাঁর মুক্ত বাহু দিয়ে স্বচ্ছভাবে বনহুরকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর কন্যা জীম্‌স মীরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রোদন করতে লাগলেন।

❑

ইরান শাহ কিছুটা সুস্থ হবার পর বললেন—জ্যাম্‌সকে হত্যা করেছো জেনে আমি যারপরনাই শান্তি লাভ করেছি মনির। কিন্তু আরও একটি ভয়ঙ্কর শত্রু আছে, যে শুধু নর রক্তপিপাসু নয়, সাংঘাতিক জীব-জলদানব।

জীম্‌স মীরাই জবাব দিল—বাবা, তুমি শুনে আরও খুশি হবে যে, জলদানব কিউকিলাকেও এই যুবক নিহত করেছে।

বলো কি মীরা।

হ্যাঁ বাবা।

ইরান শাহ এবার দু'হাতে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরলেন —এও কি সত্যি কথা?

হ্যাঁ, সত্যি! শাহানশাহ, আপনি সম্পূর্ণ রাহুমুক্ত—

বনহুরের কথায় ইরান শাহের মুখ দীপ্ত-উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—বাবা মনির আমি তোমাকে আমার সব দেবো; আমার সব দেব তোমাকে। নাও, যত খুশি মণিমুক্তা যা তোমার ইচ্ছা নাও।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বললো—শাহানশাহ, আমার এসবে কোনো প্রয়োজন নেই।

তা হয় না বাবা, তোমাকে নিতেই হবে কিছু। এসো আমার সঙ্গে যা তোমার মনে চায় নেবে।

ইরান শাহ বনহুর আর জীম্‌স মীরাসহ রত্নদ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। এ যেন এক অদ্ভুত রাজ্য, চারদিকে শুধু মুণিমুক্তাখচিত নানারকম দেব-দেবীর মূর্তি আর সেসব দেব-দেবী মূর্তির পাদমূলে এক-একটি জ্বালা

বা বাক্স সাজানো রয়েছে। বাক্সগুলোর ঢাকনা উঁচু করে ধরলেন ইরান শাহ। তারপর বললেন—নাও, যত খুশি নাও।

বনহুর বললো—থাক ওসবের প্রয়োজন হবে না আমার।

তা হয় না, তোমাকে কিছু নিতেই হবে বাবা।

ইরান শাহ একটির পর একটি জ্বালার ঢাকনা খুলে ধরতে লাগলেন। উজ্জ্বল নীলাভো আলোয় ঝক্‌মক্ করে উঠছিলো চারদিকে।

ইরান শাহ কতকগুলো মণিমুক্তা তুলে নিয়ে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন—এগুলো তোমাকে নিতেই হবে মনির।

বনহুর এবার কোন কথা বলতে পারলো না, ইরান শাহের হাত থেকে উজ্জ্বল নীলাভো মণিমুক্তাগুলো নিয়ে পকেটে রাখলো।

ইরান শাহ খুশি হলেন, তিনি বহু লোক দেখেছেন কিন্তু বনহুরের মত লোভহীন কাউকে তিনি দেখেননি। রত্নদ্বীপের মনিমুক্তা তাকে বিচলিত করতে পারলো না।

এক সময় রত্নদ্বীপ দেখা শেষ হলে বললেন ইরান শাহ—বৎস, তুমি জ্যাম্‌স আর কিউকিলাকে হত্যা করে আমার কন্যা এবং আমাকে আশু মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছো। রক্ষা করেছো আমার রত্নদ্বীপ। এবার দয়া করে আমাকে আমার রাজ্যে পৌঁছে দিয়ে কৃতার্থ করো।

বনহুর মৃদু হেসে বললো—শাহানশাহ, আমি সেজন্য প্রস্তুত আছি। যতক্ষণ আপনাকে এবং আপনার কন্যাকে স্বদেশে পৌঁছে দিতে না পেরেছি ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত নই।

❑

বনহুর ইরান শাহ এবং তাঁর কন্যা জীম্‌স মীরাকে নিয়ে ইরান রাজ্যে ফিরে এলো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন শাহানশাহ, ভুলে গেলো এতদিনের নির্মম কষ্টের কথা, শাহানশাহ ভাবতেও পারেননি আবার তিনি মুক্তিলাভ করবেন, আবার ফিরে আসবেন নিজ রাজ্যে—এ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে

ছিলো, কারণ জ্যাম্স আর কিউকিলার কবল থেকে কোনদিনই পরিত্রাণের আশা ছিলো না তাঁর।

জীম্স মীরার আনন্দও যেন ধরছে না, বিশেষ করে পিতার উদ্ধার এবং জ্যাম্স আর কিউকিলার হত্যা তার মনকে স্বচ্ছ করে তুলেছিলো। আর একটি বাসনাও তাকে উচ্ছল আনন্দে মুখর করে তুলেছিলো—অপরিচিত যুবকটিকে নিজের করে পাবে সেই আশায়। বড় ভাল লাগছিলো বনহুরকে জীম্স মীরার।

শাহানশাহ এবং জীম্স মীরার আনন্দে বনহুরও বেশ তৃপ্তি অনুভব করছিলো।

শাহানশাহ এবং জীম্স মীরাসহ যখন ইরান রাজদরবারে হাজির হলো বনহুর তখন সে বিস্ময়াহত হয়ে পড়লো। রাজমন্ত্রী তখন ইরান সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। সে বাদশাহ নাশাদ এবং তাঁর কন্যা জীম্স মীরাকে অস্বীকার করলো। উন্মাদ বলে বাদশাকে বন্দী করার জন্য আদেশ দিল।

বনহুর স্তব্ধ হয়ে গেলো মন্ত্রীবরের কথা শুনে প্রধান সেনাপতি এবং অন্যান্য সবাই বাদশাহকে চিনতে পেরেছিল কিন্তু উপস্থিত বাদশাহের বিপক্ষে কোন কথা বলার সাহস তাঁরা পেলো না।

বাদশাহ নিরুদ্দেশ হবার পর মন্ত্রী রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছিলো, কিন্তু জ্যাম্স পুনরায় রাজকন্যা মীরাকে চেয়ে বসলো এবং ভয় দেখালো জলদানব কিউকিলা দ্বারা তার রাজ্য ধ্বংস করেফেলা হবে যদি মীরাকে তার হস্তে অর্পণ না করেন।

মন্ত্রী রাজ্যের মঙ্গলার্তে রাজকন্যা মীরাকে সমর্পণ করেছিলো সেদিন। প্রথম মন্ত্রীবর কুচক্রী ছিলো না সে বাদশাহর অভাবে অন্যান্যের মতামত নিয়েই সিংহাসনে উপবেশন পূর্বক রাজ্য চালনার ভার গ্রহণ করেছিলো।

কিন্তু রাজসিংহাসনে উপবেশনের পর তার মধ্যে জেগে উঠে এক লালসাপূর্ণ প্রাণ। সিংহাসনের মোহ তাঁকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে।

ক্রমে মন্ত্রীবর ইরান রাজ্যে নিজেকে একমাত্র অধিষ্ঠাতা বলে মেনে নেবার জন্য প্রজাদের বাধ্য করে ছলে-বলে কৌশলে।

অনেকেই শাহ নাশাদের অন্তর্ধানে মুষড়ে পড়েছিল। তারা সর্বান্তঃকরণে বাদশাহর আগমন প্রতীক্ষায় উদগ্রীব ছিলো। তারা মন্ত্রীবরকে কিছুতেই বাদশাহ বলে মেনে নিতে চাইছিলো না।

মন্ত্রীবর এইসব নাগরিকের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলো। অনেক ব্যক্তিই মন্ত্রীর নির্মম আচরণ মাথা পেতে গ্রহণ করতে লাগলো তবু তাঁকে বাদশা বলে স্বীকার করলো না। দেশব্যাপী প্রজাদের মধ্যে শুরু হলো এক বিদ্বেষ ভাব। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে সাহসী হতো না। যদি কেউ কিছু বলতো বা মন্ত্রীবরের বিরুদ্ধাচরণ করতো তাকেই কারারুদ্ধ করা হতো না হয় দেওয়া হত মৃত্যুদণ্ড।

প্রধান সেনাপতি প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তিনি মন্ত্রী বরের উপর প্রসন্ন ছিলো না। ভিতরে ভিতরে তিনি মন্ত্রীকে দেখতে পারতেন না। গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করতেন এবং বাদশাহ নাশাদের অনুসন্ধান করতেন।

আজ যখন ইরানশাহসহ রাজকুমারী রাজদরবারে হাজির হলো তখন দরবারস্থ সকলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠে ছিলো; কিন্তু যে মুহূর্তে মন্ত্রীবর অস্বীকার করে বসলেন—কে এইবৃদ্ধ, আমি চিনি না—বন্দী করো এদের।

বনহুর তখন লক্ষ্য করেছিলো—সেনাপতির চোখ দু'টো ক্রুদ্ধভাবে জ্বলে উঠেছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলো তাঁর মুখমণ্ডল। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কিছু বলার সাহস পাচ্ছিলেন না যেন তিনি। শুধু সেনাপতিই নন, দরবার কক্ষের অনেকেই বাদশাহ এবং তাঁর কন্যাকে চিনতে পেরেছিলো।

মন্ত্রী রাজার কথায় আসল রাজা যখন বন্দী হলেন তখন দরবারে সবাই বিস্ময়াহতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে পড়লো, কারো কণ্ঠ দিয়ে কোন কথা বের হলো না।

মন্ত্রীরাজার আদেশ পালন হবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়লো।

বাদশাহ আর জীম্‌স মীরা বন্দী হলো।

বন্দী হবার পর শাহানশাহ এবং মীরা ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাদের বন্ধুর সন্ধান করতে লাগলো কিন্তু রাজদরবারের আশে পাশে তাকে নজরে পড়লো

না। সন্দিহান হয়ে উঠলো ইরান শাহের মন, জীম্‌স মীরার মনেও দাগ কাটলো। এতোক্ষণ যে সর্বসময় সঙ্গে সঙ্গে ছিলো হঠাৎ সে কোথায় উধাও হলো। তবে কি তারই কোন চক্রান্ত রয়েছে তাদের এই বন্দী হবার পিছনে?

ইরান শাহ আর ইরান রাজকুমারীকে বন্দী করে কারাগারে নিয়ে আটকে রাখা হলো। শয়তান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কেউ সাহসী হলো না।

দেশবাসী জানালো—একজন উন্মাদ ইরান রাজ্যের সিংহাসনের অধিকার নিয়ে নিজকে ইরান শাহ বলে পরিচিত করার প্রচেষ্টা নেওয়ায় তাকে বাদশাহ বন্দী করেছেন।

জনগণের মুখে মুখে কথাটা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়লেও সেদিন রাজদরবারে যেসব রাজকর্মচারী উপস্থিত ছিলো তাঁরা সবাই জানলেন কতবড় একটা অন্যায় সংঘটিত হলো।

ইরান শাহ আর জীম্‌স মীরা অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী হয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলো। তারা কত আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে এসেছিলো নিজ রাজ্যে, সব বাসনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে! ইরান শাহ কন্যাকে বললেন—দেখলি মা, কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। নিজ রাজ্যে ফিরে এসে লাঞ্ছিত হবার চেয়ে ইরান সাগরতলে মৃত্যুই শ্রেয় ছিলো। মনির চক্রান্ত করে আমাদের বন্দী করলো।

জীম্‌স বললো—বাবা এতে ওর কি স্বার্থ থাকতে পারে?

স্বার্থ না থাকলে সে অমনভাবে আমাদের বিপদে ফেলে সরে পড়তো না।

কিন্তু ওকে আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারছি না। ফ্রেণ্ড যদি জ্যাম্‌স আর কিউকিলাকে হত্যা না করতো তাহলে আমাদের কি সংঘাতিক অবস্থা হতো? বাবা, বিশেষ করে তোমার জন্য বড় দুর্ভাবনা ছিলো।

ব্যথা করুণ হাসি হাসলো ইরান শাহ—তার চেয়েও বেশি দুর্ভোগ এখন আছে আমাদের ভাগ্যে। মীরার মন্ত্রী ইলিয়াস আমাদের হত্যা না করে শান্তি পাবে না।

মীরা আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠে বললো—বাবা এখন উপায়?

উপায় কিছুই নেই মা। মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকতে হবে।

একটু চিন্তা করে বললো জীম্‌স মীরা—মনিরকে আমি এখনও অবিশ্বাস করতে পারছি না বাবা, কারণ রত্নদ্বীপের রত্ন যাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি---

জানিস না মা সব ছলনা। যুবক অত্যন্ত চালাক আর বুদ্ধিমান। জ্যাম্‌স আর কিউকিলা হত্যা করে সে প্রথমে নিজের পথ খোলাসা করে নিয়েছে। তারপর সে তোকে মুগ্ধ করেছে নানাভাবে। রত্নদ্বীপের ম্যাপের সন্ধান পেয়েছে তোর কাছে। ম্যাপখানা হস্তগত করার পরও সে তোকে বাধ্য করেছে রত্নদ্বীপে আসতে এবং আমার সঙ্গে তোর মিলনের মধ্যেমে নিজকে বিশ্বাসী করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে---

জীম্‌স মীরা অবাক হয়ে শুনে চলেছে পিতার কথাগুলো।

যদিও অন্ধকার কারাকক্ষে পিতার মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো না তবু সে উপলব্ধি করছে তাঁর হৃদয়ের ব্যথা। লোকটাকে সে দৃঢ় বিশ্বাস করেছিলো কিন্তু পিতার কথায় জীম্‌সের মনেও অবিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটলো।

শাহানশাহ বলে চললেন—ইলিয়াসের পরামর্শেই মনির সাধু সেজে এ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলো, কাজ সমাধা করে নিজ চরিতার্থ পূর্ণ করেছে।

জীম্‌স মীরা নীরব রইলো, কোনো কথা সে বলতে পারলো না।

এদিকে বাদশাহকে বন্দী করেও নিশ্চিন্ত হলো না মন্ত্রী ইলিয়াস। তিনি গোপনে বাদশাহ ও তাঁর কন্যাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। কোনোক্রমে বাদশাহ এবং রাজকন্যাকে জীবিত রাখা উচিত নয় বুঝতে পারলো শয়তান মন্ত্রীবর।

❑

গভীর রাতে সমস্ত ইরান নগরী যখন নিদ্রায় অচেতন,তখন কারাগার কক্ষে প্রবেশ করলো মন্ত্রীবর শয়তান ইলিয়াস।

ইলিয়াসের সঙ্গে রয়েছে আরও দুজন অনুচর। এক জনের হস্তে সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা আর একজনের হস্তে রয়েছে জ্বলন্ত মশাল।

মন্ত্রী রাজ-কারাগারের সম্মুখে পৌঁছতেই রক্ষী লৌহকপাট উন্মোচন করে সরে দাঁড়ালো।

নিস্তব্ধ রাত্রির জমাট অন্ধকারে একটা কড়কড় শব্দের প্রতিধ্বনি জাগলো। ভূতলে শায়িত ইরান শাহের নিদ্রা ছুটে গেলো মুহূর্তের জীম্‌স মীরাও আচমকা উঠে বসলো। তাকালো তারা সম্মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো উভয়ের মুখমণ্ডল।

সাক্ষাৎ যমদূতের মত ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে কারাগারে প্রবেশ করছে মন্ত্রী ইলিয়াস ও তার অনুচরদ্বয়। দ্বিতীয় অনুচরের হস্তের মশালের আলোতে প্রথম অনুচরের হস্তে ছোরাখানা ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠলো।

শিউরে উঠলো জীম্‌স মীরা। ভয়ে সে পিতাকে জড়িয়ে ধরলো—বাবা।

জীর্ণ দেহ, মলিন ছিন্নভিন্ন পোশাক পরিহিত ইরান শাহ কন্যাকে বুকে চেপে ধরলেন—মা! ভয় নেই মা খোদা আমাদের সহায় আছেন।

ইলিয়াস বজ্রপদক্ষেপে ইরান শাহ আর রাজকুমারী মীরার সামনে এসে দাঁড়ালো—কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না শাহানশাহ। যে দু'দিন বাঁচতে তাও আর পারলে না। বলো কে তোমাদের উদ্ধার করে এখানে এনেছে?

ইরানশাহ ও জীম্‌স মীরা তখন উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, পিতা-পুত্রী অসহায় করুণ চোখে তাকাচ্ছে নির্দয় পিশাচ ইলিয়াসের অগ্নিচক্ষুর দিকে। জীম্‌স মীরা বার বার দেখে নিচ্ছিলো ভীষণ চেহারার প্রথম অনুচরটির হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা, না জানি এই মুহূর্তে ঐ ছোরাখানা কার বুকে প্রবেশ করবে—হয় পিতা নিহত হবে তার চোখের সম্মুখে নয় তারই মৃত্যু হবে।

জীম্‌স মীরার চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, কর্কশ কঠিন কণ্ঠে বলে উঠলো ইলিয়াস—শাহানশাহ, আফসোস একটু পরেই তোমাকে এবং তোমার কন্যাকে পরপারে পাঠাতে হচ্ছে, কারণ ইরানের রাজসিংহাসন এখন আমার।

ইরানশাহ এতোক্ষণে কথা বললেন—বেশ, তাই নাও। ইরান সিংহাসন তুমিই নাও। কিন্তু আমাকে আর মীরাকে তুমি হত্যা করো না ইলিয়াস।

গর্জে উঠলো ইলিয়াস—রাজসিংহাসনের মায়া ত্যাগ করতে পারবে শাহানশাহ'?

পারবো। পারবো ইলিয়াস।

তাহলে কেন তুমি এখানে এলে? কে তোমাদের দু'জনকে এখানে নিয়ে এসেছে বলো?

ইরানশাহ্ জবাব দিলো—এক অপরিচিত যুবক। আর সে যুবকই কৌশলে আমাদের দু'জনাকে ইরান সাগর থেকে উদ্ধার করে তোমাদের দরবারে হাজির করেছিলো এবং তার চক্রান্তেই আমরা বন্দী হয়েছি।

ইলিয়াস তাকালো তার সঙ্গীদ্বয়ের মুখে বললো—তোমরা জানো কে সে'?

প্রথম অনুচর বললো—না শাহানশাহ্, আমরা জানি না কে সে আর কি তার পরিচয়।

ইরানশাহ্ বললেন—ইলিয়াস সে যুবক যে তোমারই একজন অনুচর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার অনুচর! না সে আমার অনুচর নয়। যাক সে যেই হউক কোনো স্বার্থ নিয়েই সে তোমাকে আর রাজকন্যাকে নিয়ে রাজদরবারে হাজির হয়েছিলো—উদ্দেশ্য ছিলো রাজ সিংহাসন এবং তোমার কন্যা মীরাকে---

না, তার কোন লোভ ছিলো না। বললো মীরা।

যাক সে কথা শুনার বা জানার সময় আমার নেই। ইলিয়াস তাকালো প্রথম অনুচরের দিকে তারপর ইংগিত করলো শাহানশাহের বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়ার জন্যে।

প্রথম অনুচর ইলিয়াসের ইংগিত পাওয়া-মাত্র ছোরাখানা উদ্যত করে শাহানশাহ নাশাদের বুকে বসিয়ে দিতে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে জীম্‌স মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে পিতার বুকে—না না, আমার বাবাকে হত্যা করো না। আমার বাবাকে হত্যা করো না ইলিয়াস---

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ইলিয়াস—হাঃ হাঃ হাঃ তোমার বাবাকে হত্যা করা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। তারপর তুমি হবে আমার বেগম----কথাটা বলে মীরাকে বৃদ্ধ শাহানশাহের কাছ থেকে এক ঝটকায় টেনে নেয়।

প্রথম অনুচর এবার ছোরাখানা শাহানশাহের বুকে আমূলে বসিয়ে দিতে যায়।

কিন্তু ছোরাখানা শাহানশাহের বুকে বিদ্ধ হবার পূর্বেই প্রথম অনুচরটি তীব্র আর্তনাদ করে পড়ে যায় ভূতলে।

কারাগারস্থ প্রত্যেকেই চমকে উঠলো।

ইলিয়াস তাকালো ভূলুণ্ঠিত অনুচরটির দিকে রক্তে ভেসে যাচ্ছে কারাগারের মেঝে, অনুচরটির পিঠে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে একখানা তীক্ষ্ণ ধার ছোরা।

ইরান শাহ এবং জীম্‌স মীরাও হতবাক বিস্মিত হয়ে পড়লো —কে তাদের যমদূতকে যমালয়ে পাঠালো। সবাই তাকালো কারাগার কক্ষের দরজার দিকে।

মুহূর্তে আশ্চর্য স্তব্ধ হয়ে পড়লো সবাই, দেখতে পেলো, কারাগার কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত জমকালো পোশাক পরা লোক। মাথায় পাগড়ী দিয়ে মুখের নিচের অংশ ঢাকা। কাজেই তাকে চিনবার কোনো উপায় নেই।

সকলের চোখেমুখে যখন ভীত আর বিস্ময় ভাব, তখন জমকালো মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সম্মুখে। সবাই দেখলো দক্ষিণহস্তে আরও একটি সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

ইলিয়াস অল্পক্ষণ নিজকে সংযত করে নিলো, তারপর কঠিন কণ্ঠে বললো—কে তুমি?

আমি কে সে পরিচয় নাই বা শুনলে কিন্তু মনে রেখো ইরান সিংহাসন তোমার জন্য নয়।

আমার জন্য নয়। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো ইলিয়াস।

গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বললো কালোমূর্তি —না, কারণ ইরান সিংহাসনের আসল অধিকারী ফিরে এসেছে।

কে তুমি? ইলিয়াস চিৎকার করে উঠলো।

এবার জমকালো মূর্তি বলে উঠলো—আমার পরিচয় জানার যখন এতো সখ তাহলে শোন দস্যু বনহুর আমার নাম।

দস্যু বনহুর। ভয়ার্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো ইলিয়াস।

ইরান শাহ আর জীম্‌স মীরাও সেই সঙ্গে ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো—দস্যু বনহুর।

দ্বিতীয় অনুচরটি যে এতোক্ষণ মশাল হস্তে দণ্ডায়মান ছিলো দস্যু বনহুর নাম শ্রবণে তার হাত থেকে খসে পড়লো জলন্ত মশালখানা।

বনহুর দৃঢ়কণ্ঠে বললো—ইলিয়াস মশাল উঠাও।

কম্পিত হস্তে ইলিয়াস মশালখানা ভূতল হতে তুলে নিলো।

বনহুর বললো—দাও, তোমার অনুচরটির হাতে দাও মশালখানা।

অনুচরের হাতে মশালখানা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ইলিয়াস।

দ্বিতীয় অনুচরটি মশাল হস্তে থরথর করে কাঁপছে।

বনহুর এবার ইলিয়াসের পাঁজরে তার ধারালো ছোরাখানা চেপে ধরে বললো—তোমার অনুচরের দেহ থেকে ছোরাখানা খুলে নাও তারপর বাদশাহ শাহান্‌শাহ ও তার কন্যার আর রাজকুমারীর বন্ধন উন্মোচন করে দাও।

ইলিয়াস বাধ্য ছাত্রের মত দস্যু বনহুরের আদেশ পালন করলো।

বৃদ্ধা ইরানশাহ এবং রাজকুমারী মীরার চোখেমুখে বিস্ময় আর আনন্দ। খুশিভরা দু'নয়নে অতৃপ্ত চাহনি, না জানি ঐ কালো পোশাকের তলে কেমন একখানা মুখ লুকিয়ে আছে।

ইলিয়াস ইরানশাহ আর জীম্‌স মীরার বন্ধন উন্মোচন করে দিয়েই হঠাৎ আক্রমণ করে বসলো দস্যু বনহুরকে।

বনহুর মুহূর্তে সরে দাঁড়ালো।

ইলিয়াস হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে কিন্তু পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো, পুনরায় ছোরাখানা বসিয়ে দিতে গেলো বনহুরের বুকে।

বনহুর বাম হস্তে ইলিয়াসের ছোরাসহ হাতখানা ধরে ফেললো খপ্‌ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দক্ষিণ হস্তস্থিত ছোরাখানা বসিয়ে দিলো ইলিয়াসের তলপেটে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে ইলিয়াস পড়ে গেলো ভূতলে। খানিকক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করে নীরব হয়ে গেলো তার দেহটা।

ইরানশাহ আর জীম্‌স মীরা হতবাক নিস্পন্দ হয়ে পড়লো, একি বিস্ময়কর ব্যাপার! কে এই অদ্ভুত লোকটি। কেমন করেই বা এই লৌহ

কারাঘরে প্রবেশ করলো। আর ইলিয়াসের মত শক্তিশালী শয়তানকে তুচ্ছু কুকুরের মত হত্যা করলো।

জমকালো মূর্তি নিয়ে যখন ইরানশাহ আর জীম্‌স মীরা ভাবছে তখন কারাগার কক্ষ হতে বেরিয়ে গেছে জমকালো মূর্তিটা। কোথায় গেলো, কেমন করে গেলো ভেবে পেলো না তারা।

মশালধারী অনুচরটি তখনও মশাল হস্তে থর থর করে কাঁপছে। বনহুর কারাঘর হতে বেরিয়ে সোজা এসে দাঁড়ালো প্রধান সেনাপতির প্রাসাদের পিছনে। তারপর উঠে গেলো উপরে।

সেনাপতি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলো।

বনহুর প্রবেশ করলো তার কক্ষে। খাটের পাশে এসে দাঁড়ালো তীক্ষ্ণ ছুরির আগা দিয়ে চাদরখানা সরিয়ে ফেললো সেনাপতির দেহ থেকে।

আচম্‌কা জেগে উঠলো সেনাপতি, ধড়মড় করে উঠে বসে সম্মুকে তাকিয়ে আরষ্ট হয়ে গেলো —কে তুমি—কি চাও?

বনহুর বললো—আমার পরিচয়ে প্রয়োজন নেই শুন সেনাপতি তোমাদের ইরানশাহ মুক্ত তাঁকে এনে রাজসিংহাসনে বসাও।

সেনাপতি মুহূর্তে ভয় ও ভীতি বিস্মৃত হয়ে গেলেন, শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালেন তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন—সত্যি শাহানশাহ মুক্ত?

হ্যাঁ, তিনি মুক্ত আর শয়তান ইলিয়াস নিহত।

ইলিয়াস নিহত।

হ্যাঁ, আমিই তাকে হত্যা করেছি। শীঘ্র যাও শাহানশাহকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে নগরময় ঘোষণা করে দাও, আমাদের ইরান শাহ নাশাদ ফিরে এসেছেন। কথাটা শেষ করে বনহুর দ্রুত বেরিয়ে যায় যে পথে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করেছিল সেই পথে।

হতবাক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সেনাপতি কে এই অদ্ভুত ব্যক্তি, কিইবা এর পরিচয় আর ইরান শাহের জন্যই তার এত দরদ কেন! কিন্তু কে দেবে এর জবাব—জমকালো মূর্তি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেনাপতি সেই মুহূর্তে কারাগরে এসে হাজির হলেন এবং ইরান শাহকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

শয়তান মন্ত্রী নিহত হওয়ায় সেনাপতি অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

পরদিন রাজ্যময় এক মহা আনন্দহিল্লোল বয়ে চললো। রাজা প্রসাদ সজ্জিত করা হলো। পথঘাট সব আলোকমালায় ঝলমল করে উঠলো। দীন-দুঃখীদের মধ্যে অর্থ বিরতণ করা হতে লাগলো।

রাজ্যের প্রতিটি লোকের মনে খুশির উচ্ছ্বাস তাদের শাহানশাহ ফিরে এসেছেন। সবাই রাজপ্রাসাদের চারপাশ ঘিরে দাঁড়ালো, সকলেরই ইচ্ছা শাহানশাহকে একনজর দেখবে।

সেনাপতি ইরান শাহনাশাহকে সিংহাসনে উপবেশন করিয়ে রাজকন্যা মীরাকেও বসালেন তাঁর পাশে। দরবারকক্ষ সরগরম হয়ে উঠলো। অগণিত প্রজা এসেছে শাহানশাহের দর্শন আশায়।

হঠাৎ নজরে পড়লো জীম্‌স মীরার অগণিত প্রজাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সেই যুবক যে তার পিতা এবং তাকে জ্যাম্‌স বাবা আর কিউকিলার কবল থেকে উদ্ধার করে এনেছিলো। জীম্‌স মীরার চোখদুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। পিতাকে লক্ষ্য করে বললো—বাবা, ঐ দেখো সেই যুবক দাঁড়িয়ে আছে।

শাহানশাহের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বনহুরের উপর। চমকে উঠলেন—শাহানশাহ। তিনি ভুল বুঝলে—মনে করলেন এই যুবক ইলিয়াসের গুপ্তচর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেনাপতিকে আদেশ দিলো—বন্দী করো এই যুবককে,নিশ্চয়ই ও মন্ত্রীবর ইলিয়াসের লোক।

সেনাপতি বাদশাহের হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বনহুরকে গ্রেফতার করার জন্য অনুচরদের নির্দেশ দিলো এবং সে নিজেও তরবারি খুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পাশের একজন সৈনিকের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সেনাপতির অস্ত্রাঘাত প্রতিরোধ করলো। সে একা দশ-বিশ জন সৈনিকের সঙ্গে লড়াই করে চললো।

হঠাৎ এই অদ্ভুত কাণ্ডে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলো দরবারকক্ষের সবাই। যে যেদিকে পারলো সরে পড়ে আত্মরক্ষা করলো। কিন্তু আশ্চর্য একজন যুবকের সঙ্গে এতগুলো সৈনিক পেরে উঠলো না। এমন কি সেনাপতিকে ভূতলশায়ী করে তার বুকে তরবারিখানা চেপে ধরলো।

সেনাপতির এই অবস্থা যখন তখন অন্যান্য সৈনিক অগ্রসর হতে সাহসী হলো না, কারণ বনহুরের অস্ত্রের অগ্রভাগ তখন সেনাপতির পাঁজরে ঠেকে রয়েছে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কেউ এক পা এগুলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেবো। খবরদার কেউ অগ্রসর হবে না।

বনহুরের চেহারা এবং তার কণ্ঠস্বরে দরবারকক্ষের সবাই আরষ্ট হয়ে পড়েছে, কেউ এগুতে সাহসী হলেন না।

দরবারকক্ষের মেঝেতে চীৎ হয়ে পড়ে আছে ইরান সেনাপতি খায়বার আলম, দস্যু বনহুরের তীক্ষ্ণ ধার তরবারির অগ্রভাগ তার পাঁজরে ঠেকে রয়েছে যে কোন মুহূর্তে তরবারিখানা তার পাঁজর ভেদ করে বেরিয়ে আসতে পারে।

ইরান শাহ প্রমাদ গণলেন তিনি না পারছেন সৈনিকদের হুকুম করতে, না পারছেন নিজে অস্ত্র ধরতে। হয়তো এখনি তার প্রিয় সেনাপতির প্রাণ বিনষ্ট হতে পারে।

বনহুর এবার বললো—দরবারকক্ষে যার যার হস্তে যে যে অস্ত্র আছে সবগুলো সেনাপতির শিয়রে নিক্ষেপ করো নইলে সেনাপতির মৃত্যু অনিবার্য।

ইরান শাহ নিরুপায় হয়ে নির্দেশ দিলো, তোমরা সমস্ত অস্ত্র সেনাপতির শিয়রে নিক্ষেপ করো।

সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করলো সৈনিকগণ।

সেনাপতির শিয়র অস্ত্রে স্তূপাকার হয়ে উঠলো।

বনহুর আর কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো দরবারকক্ষ হতে বাইরে।

সেনাপতি ভূতল শয্যা ত্যাগ করেই অস্ত্র উঠিয়ে নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন—সবাই অস্ত্র হাতে উঠিয়ে নাও। গ্রেফতার করো ঐ অজানা যুবকটিকে।

ইরান শাহ কিছু বলার পূর্বেই সেনাপতি অন্যান্য সৈনিক সহ দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না তারা সেই অজ্ঞাত যুবকটিকে। রাজ্যময় ঘোষণা করে দেওয়া হলো—যেখানেই হউক কোন অজানা-অচেনা লোক নজরে পড়লে তাকেই যেন রাজদরবারে হাজির করা হয়। যে আসল ব্যক্তিকে আনতে পারবে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

শহরময় ছড়িয়ে পড়লো ইরানশাহের লোক। সকলেই সন্ধান করতে ফিরতে লাগলো সেই অজ্ঞাত যুবকটির।

দরবারকক্ষে অনেক অজানা লোককেই ধরে আনা হলো কিন্তু ইরান শাহ সবাইকে পরীক্ষা করে ছেড়ে দিলো আসল জনকে পেলেন না।

সপ্তাহ কেটে গেলো প্রায় কিন্তু কেউ আজও সেই অচেনা যুবকটিকে পাকড়াও করে আনতে সক্ষম হলো না।

একদিন ইরান শাহ আর মীরা তাদের বিশ্রামাগারে বসে আলাপ-আলোচনা করছে। আবার রাজ্যে ফিরে এসেছে অনাবিল শান্তিধারা। শয়তান মন্ত্রীবর ইলিয়াসের অন্যায় অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো তারা এখন নিশ্চিন্ত।

রাজ্যের ব্যাপার নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিলো এমন সময় হঠাৎ তাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় সেই জমকালো মূর্তি। সমস্ত দেহ তার জমকালো পোশাক, মাথায় কালো পাগড়ী। মুখে একখানা কালো রুমাল বাঁধা। হাতে একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

ইরান শাহ এবং জীম্‌স মীরা জমকালো মূর্তিটাকে দেখে বিস্মিত হলো আর হলো আনন্দিত। একদিন এরই সাহায্যে ইরান শাহ ফিরে পেয়েছেন তাঁর হারানো রাজ্য। ফিরে পেয়েছে তাঁর জীবন, মান-সম্মান আত্মীয়-স্বজন। শুধু তাই নয়, পথের কাঁটা শয়তান ইলিয়াসকে হত্যা করেছে এই জমকালো মূর্তি।

ইরান শাহ আর জীম্‌স মীরা জমকালো মূর্তির আগমনে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পিতা—পুত্রীর মুখমণ্ডল।

বললেন ইরান শাহ—আপনি।

আপনি নয়—বলুন তুমি।

অবাক হলেন ইরান শাহ আর জীম্‌স মীরা। জমকালো মূর্তি বলে কি। ঢোকগিলে বললেন ইরান শাহ—তুমি এসেছো। কি বলে যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। জানি না তুমি কে, কি তোমার পরিচয়। খোদার ফেরেস্তা কিনা তুমি, তাও জানি না----

সেদিন তো বলেছি আমি দস্যু বনহুর।

কিন্তু তুমি মানুষ নও, ফেরেস্তাই হবে---

না, আমি মানুষ এবং সাধারণ মানুষ। ইরান শাহ আমি শুনলাম, আপনি এক যুবকের সন্ধানে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন?

হ্যাঁ, সে আমার শত্রু। শয়তান ইলিয়াসের গুপ্তচর। তাকে কেউ যদি গ্রেফতার করে এনে দিতে পারে তাহলে আমি তাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো।

আমি যদি তাকে হাজির করে এনে দেই?

আমি তোমাকেই লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো।

বেশ.....বনহুর দক্ষিণ হস্তে নিজের মুখের রুমাল খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে অদ্ভুত শব্দ করে উঠলেন ইরান শাহ আর জীমস্ মীরা—তুমি......তুমি......

হ্যাঁ, আমিই তোমাদের সেই অচেনা-অজানা বন্ধু।

ভয়বিহ্বল, আতঙ্কভরা কণ্ঠে বললেন ইরান শাহ ভাবলেন, নিশ্চয়ই বনহুর তাঁর উপর ক্রোধান্ধ হয়ে পড়েছে—তাই হতবুদ্ধি হয়ে বনহুরের পা চেপে ধরতে গেলেন।

বনহুর ধরে ফেললো তাঁকে—ক্ষান্ত হন শাহানশাহ। আমি আপনার এ ভুলের জন্য মোটেই অসন্তুষ্ট নই।

ইরান শাহ আবেগভরা কণ্ঠে বললেন—শুধু লক্ষ টাকাই তোমাকে দেবো না, আমার রত্নদ্বীপ এবং আমার কন্যা মীরাকেও আমি সমর্পণ করলাম তোমার হাতে। তুমি আমার রক্ষক নও, আমার জীবনদাতা......

একটু হেসে বললো বনহুর—অনেক অনেক শুকরিয়া শাহানশাহ, এ দু'টির একটিরও প্রয়োজন আমার নেই।

জীমস্ মীরা অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—ফ্রেণ্ড।

ইরান শাহ করুণ ব্যথা ভরা কণ্ঠে বললো—মীরা তোমাকে ভালোবাসে।

আমি তার জন্য কৃতজ্ঞ শাহানশাহ, কিন্তু.......

জীমস্ এবার বনহুরের দিকে অসহায় চোখে তাকালো, সে চাহনী নিষ্পাপ, পবিত্র।

বনহুর জীম্‌সের মুখে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে নিলো, তার মুখ খানাও ব্যথাকরুণ হয়ে উঠেছে। বললো বনহুর—শাহানশাহ বিদায়। জীমস্ মীরা বিদায়......

জীম্‌স বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—না না, আমি তোমাকে বিদায় দেবো না বন্ধু। আমি তোমাকে........

কিন্তু ততক্ষণে দস্যু বনহুর বাইরে বেরিয়ে গেছে।

জীম্‌স মীরা ছুটে এলো বাইরে, রাজপ্রাসাদের দ্বিতলের রেলিং-এর পাশে ঝুঁকে পড়ে তাকালো নিচে, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলো—ফ্রেণ্ড.....ফ্রেণ্ড.....ফ্রেণ্ড.......

জমাট অন্ধকারে রাজকুমারী জীম্‌সের কণ্ঠ কেঁপে কেঁপে ছুটে চললো।

ইরান শাহ এসে দাঁড়ালেন কন্যার পাশে, কাঁধে হাত রেখে ডাকলো—মীরা! সে চলে গেছে মীরা।

❑

ঝাম শহরে ফিরে এলো দস্যু বনহুর।

মহারাজ মোহন্ত সিন্ধু বনহুরকে দেখে আনন্দে আর বিস্ময়ে ফেটে পড়ার উপক্রম হলেন। তিনি রাজ্যজয়ের আনন্দ উপভোগ করলেন হৃদয়ে। মহারাজ মোহন্ত সিন্ধুর সঙ্গে ঝাম শহরের প্রতিটি জনগণ আনন্দে আত্মহারা হলো। ঝাম সর্দার ছুটে এলো দলবল নিয়ে।

ঝাম পর্বতের গুহায় বনহুরের যে আস্তানা আছে সেখানেও সংবাদ পৌঁছলো। সর্দার জীবিত আছে জানতে পেরে খুশিতে উন্মত্ত হয়ে উঠলো তারা।

সবচেয়ে আজ বেশি খুশি মালা।

মালা বনহুরকে পুষ্পহার পরিয়ে অভিনন্দন জানালো।

বনহুর যখন জানতে পারলো, রহমান তার মৃত্যু হয়েছে সন্দেহে শোকাভিভূত হয়ে ফিরে গেছে কান্দাই অভিমুখে তখন সে নিজেও বেশ চিন্তিত হলো। আর একদিকে খুশি হলো সে কিউকিলা নিহত হয়েছে জেনে।

বনহুর স্বয়ং সমুদ্রতীরে এসে পর্বত আকার কিউকিলার মৃতদেহটা দেখলো। তার ডিনামাইট তাহলে ব্যর্থ হয়নি। যদিও বনহুর বুঝতে পেরেছিলো, তার বসানো ডিনামাইট দ্বারা নিশ্চয়ই দৈত্যরাজ কিউকিলা

নিহত হয়েছে। তবু মনটা সচ্ছ হয়েছিলো না যতক্ষণ কিউকিলা নিহত সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হতে না পেরেছিলো।

কিউকিলার মৃতদেহ দেখে বনহুর আশ্বস্ত হলো, তৃপ্ত হলো তার মন। বনহুর মহারাজ মোহন্ত সিন্ধুকে বললো—দৈত্যরাজের দেহটা কোনোক্রমে মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত।

বনহুরের নির্দেশ অনুযায়ী তাই করা হলো।

কিউকিলার বিশাল দেহটা মাটির মধ্যে আশ্রয় পেল।

বনহুরকে পেয়ে ঝাম শহরে আনন্দ উৎসব শুরু হলো। খুশির অন্ত নেই কারো। শত শত লোক বনহুরকে দেখার জন্য আসতে লাগলো রাজদরবারে। কারণ ঝাম শহরবাসী প্রত্যেকে আজ তার কাছে কৃতজ্ঞ। সাংঘাতিক মৃত্যুর মুখ থেকে আজ তারা মুক্তি পেয়েছে।

বনহুর সকলের অভিনন্দন হাসিমুখে গ্রহণ করে চললো।

কিন্তু বিপদে পড়লো বনহুর মোহন্ত সিন্দুর কন্যা মালাকে নিয়ে। মহারাজের ইচ্ছা, দেবরাজের সঙ্গে কন্যা মালার বিয়ে দেন এবং সেভাবেই পূর্বে কথা ছিলো।

বনহুর মোহন্ত সিন্ধুকে জানালো, সে হিন্দু নয়—মুসলমান; কাজেই তাদের বাসনা সিদ্ধ হবার নয়।

মোহন্ত সিন্ধু এতোদিন জানতেন না তাই তিনি দেবরাজের হস্তে কন্যা অর্পণ করার মনস্থ করেছিলো। সব বাসনা তাঁর চূর্ণ হলো।

কিন্তু মালাকে এড়ানো বিপদ হয়ে দাঁড়ালো বনহুরের।

মালা বললো—দেবরাজ, তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে? এত নিষ্ঠুর-পাষাণ তুমি?

বনহুর মালার চিবুকটা তুলে ধরলো—তুমি হিন্দু আর আমি মুসলমান। মালা, জাতি ভিন্ন হলে কোনদিন বিয়ে হতে পারে না। এতে উভয়েরই অমঙ্গল হয়। কাজেই তোমার আমার মিলন হতে পারে না।

সরল-সহজ প্রাণে মালা সর্বান্তঃকরণে বনহুরের কথাগুলো বিশ্বাস করলো—ভাবলো, তাইতো কোন উপায় নেই দেবরাজকে পাবার। মালা নীরবে চোখ মুছলো।

বনহুর মালা আর মোহন্তরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঝাম আস্তানায় এসে পৌঁছলো। ঝাম আস্তানায় পৌঁছে প্রথমেই বনহুর ওয়্যারলেসে নূরীর সন্ধান করলো।

নূরী জানে, তার বনহুর ঝাম সাগরের অতল গহ্বরে ডুবুরী বেশে অবতরণ করে ফিরে আসেনি। রহমান তাকে সব খবর জানিয়েছিলো। কিউকিলার নিহত-সংবাদও নূরী পেয়েছে। কিন্তু নূরী কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না তার বনহুর আর নেই। মন যেন বলছে, সে বেঁচে আছে—মরেনি।

কিন্তু একটা চিন্তা তাকে বড় অস্থির করে তুলেছিলো সত্যিই যদি বনহুরের কোন কিছু ঘটে থাকে। গভীর সাগর—কত হাঙ্গর-কুমীর, আরও কতরকম জলজীব আছে। যদি বনহুরকে নিহত করে থাকে.....কিন্তু সে যেন ভাবতেই পারতো না এ কথা। তার বনহুর মরতে পারে না, তাকে বলে গেছে—সে মরবে না। সেদিনও নূরী নিজের গুহায় বসে ভাবছে কত কথা। বিয়ের রাতেই বনহুর চলে গেছে, বলে গেছে কত কথা......তুমি আমার জন্য ভেবো না নূরী, কিউকিলা হত্যা করেই আমি ফিরে আসবো! কিন্তু কই,.......আজ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেলো তবু ফিরে এলো না, বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সে এতোদিন ফিরে আসতো। নূরীর গণ্ড বেয়ে গড়িয়েছিলো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

এমন সময় নূরীর কণ্ঠের লকেটের ওয়্যারলেসে এলো তার চির-আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর.....হয়তো অবাক হচ্ছে নূরী কণ্ঠস্বর শুনে।

নূরী নিজ কণ্ঠে লকেট ওয়্যারলেসখানা গণ্ডে চেপে ধরে উচ্ছ্বাসিত আনন্দধ্বনি করে উঠলো....হুর, আমার হুর, তুমি! ......সত্যি, আমি তোমার গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি?

.....হ্যাঁ, সত্যিই আমি।

.....কোথা থেকে বলছো তুমি?

.....আমার ঝাম আস্তানা থেকে। কেমন আছো নূরী?

.....আগে বলো তুমি কেমন আছো? তবে যে রহমান বলেছিলো, তুমি নাকি সাগরতল হতে ফিরে আসোনি?

.....রহমান তোমাকে মিথ্যা বলেনি। নূরী আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। সে অনেক গল্প, এসে বলবো তোমাকে।

.....হুর তোমাকে কাছে পাওয়ার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। কতদিনে আসবে তুমি সেই প্রতীক্ষায় থাকবো।

.....অল্প কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো নূরী।

.....হুর, দেরী করবে না তো?

.....না! মোটেই না তবে যদি নতুন কোনো.....

.....কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আগে এসো তারপর সব কথা। স্মরণ রেখো তুমি কথা দিয়েছিলে, বলেছিলে—বাসর রাতে আমি তোমায় রেখে যাচ্ছি নূরী, আমি এক মুহূর্তের জন্য ভুলবো না তোমাকে। কিউকিলা হত্যা করেই ফিরে আসবো। বলো শপথ রক্ষা করবে?

.....হ্যাঁ শপথ করলাম। আচ্ছা রাখি?

আচ্ছা রাখো! খোদা হাফেজ।

নূরী উচ্ছল ঝরণার মত ছুটে গেলো নাসরিনের কক্ষে! জড়িয়ে ধরলো খুশির আবেগে তাকে, চুমোয় ভরিয়ে দিলো তার গণ্ড।

নাসরিন অবাক হলো, ব্যাপার কি! সর্দারের সাগরতলে অবতরণ সংবাদ শুনার পর থেকে নূরীকে কথা বলতে শুনেনি নাসরিন। আজ তাকে আনন্দ-মুখর দেখে সেও খুশি হলো, অবাকও হলো কিছুটা, বললো সে—নূরী, কি হয়েছে বল না!

শুভ সংবাদ! শুভ সংবাদ নাসরিন। হুর বেঁচে আছে।

সর্দার বেঁচে আছে?

হাঁ হাঁ নাসরিন। আমি জানতাম, আমার হুর মরতে পারে না।

নূরী!

নাসরিন এইমাত্র হুর ওয়্যারলেসে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। কিন্তু শোন্, তুই একথা আগেই কাউকে বলবি না। রহমান 'শাহী' জাহাজ নিয়ে কান্দাই ফিরে আসছে—এসে শোনবে, আগে তাকেও ওয়্যারলেসে জানাবো না।

বেশ তাই হবে। কিন্তু দাই মা, দাই মা যে সর্দারের জন্য চিন্তা করে নাজেহাল হয়ে পড়েছে।

আর ক'টা দিন হতে দে! আগে ফিরে আসুক।

নূরীর মনে অফুরন্ত আনন্দ জেগে উঠলো, আবার পাহাড়িয়া ঝর্ণার মত চঞ্চল হয়ে উঠলো সে।

❑

গভীর রাত।

ঘুম নেই নূরীর চোখে। একলা শয্যায় শুয়ে ভাবছে বনহুরের কথা। বিয়ের রাতে যে মালাটা বনহুর নূরীর কণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিল, সেই মালাটা নিয়ে বুকে চেপে ধরে নূরী অস্ফুটকণ্ঠে বলে—হুর, তুমি কবে আসবে? কখন আসবে তুমি? তোমার প্রতীক্ষায় আমি যে আকুল হয়ে যাচ্ছি......

ঠিক সেই মুহূর্তে একখানা ছোরা এসে গেঁথে যায় নূরীর খাটের পাশে।

চমকে উঠে নূরী, তাড়াতাড়ি ছোরাখানা তুলে নিতেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে নূরীর চোখ দুটো—হুর, তুমি এসেছো!

কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর—হাঁ নূরী!

নূরী আর থাকতে পারে না, ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে—হুর!

বনহুর নূরীকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে আনন্দ-অশ্রু বিসর্জন করে নূরী।

বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে ডাকে—নূরী!

বলো?

সত্যি যদি সাগরতলে আমার সমাধি হতো তাহলে কি করতে?

নূরী বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়—ওকথা বলো না হুর। ওকথা বলো না।

যে বিপদে পড়েছিলাম তাতে ফিরে আসা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। ভাগ্যিস, জীম্‌স মীরা আমাকে সাহায্য করে, তাই ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছি।

জীম্‌স মীরা!

হাঁ, ইরানের রাজকুমারী।

অবাক হয়ে বললো নূরী—গভীর সাগরতলে ইরান রাজকুমারী তোমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলো?

যায়নি; সে ওখানেই ছিলো।

সাগরতলে.......

হাঁ নূরী।

বুঝেছি, সেই কারণেই তুমি ভুলে গিয়েছিলে সব কথা। তোমার আস্তানার কথাও......অভিমান করে পড়ে নূরীর কণ্ঠে।

বনহুর হেসে বলে—চলো নূরী, সব বলছি তোমাকে।

চলো।

নূরী আর বনহুর খাটের পাশে এসে দাঁড়ায়।

বনহুর মাথার পাগড়ীটা খুলে রাখে। নূরী ওর জামার বোতাম খুলে দেয়। পা থেকে ভারী বুটখানাও খুলে দেয় নূরী নিজের হাতে।

বনহুর শয্যায় উঠে বসে টেনে নেয় নূরীকে কাছে। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

নূরী বলে—কই বললে না তোমার সাগরতলের বিস্ময় কর ঘটনা?

বলবো।

তবে বলো?

শোন......বনহুর বলতে শুরু করে, সাগরতলের সমস্ত ঘটনাগুলো বলে যায় সে নূরীর কাছে।

সমস্ত ঘটনা শোনার পর নূরী বলে উঠে—জীম্‌স মীরার অপরূপ সৌন্দর্য তোমাকে মোহগ্রস্ত করে ফেলেছিলো বনহুর।

বনহুর নূরীর ললাট থেকে কুঞ্চিত কেশগুলো আংগুল দিয়ে সরিয়ে দিতে দিতে বলে—ঠিক মোহগ্রস্ত নয়, কতকটা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম—

তাহলে কেন তুমি তাকে গ্রহণ করলে না? নূরীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

হঠাৎ হেসে উঠে বনহুর অদ্ভুতভাবে, তারপর চীৎ হয়ে শুয়ে পড়ে শয্যায়, শিথিল কণ্ঠে বলে—আরজ আমাকে চিনতে পারো নি বলে আফসোস্ নূরী। তুমি নিজেকে দিয়েও কি আমাকে উপলব্ধি করনি? বনহুর নূরীর চিবুকটা উঁচু করে ধরে।

নূরীর মুখ ধীরে ধীরে প্রসন্ন হয়ে আসে। বনহুরের সঙ্গে পূর্বের দৃশ্যগুলো ভেসে উঠে তার মনের পর্দায়। নূরী অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মুখ লুকায়—হুর, আমাকে ক্ষমা করো।

বনহুর নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে, আবেগভরা কণ্ঠে বলে—নূরী!

বলো?

বাসর রাতে তোমাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম বলে আমার উপর অভিমান করেছিলে, না?

হুর, আমি কোনোদিন তোমার উপর অভিমান করে থাকতে পারবো না।

আমি জানি। আর জানি বলেই তোমাকে আমার এত বিশ্বাস। নূরী, আজ আমাদের সেই বাসর রাত। কই, ফুলের মালাটা কই, দাও পরিয়ে দিই আজ আবার নতুন করে!

নূরী সেদিনের শুকনো মালাগাছা বনহুরের হাতে তুলে দেয়।

বনহুর নূরীর কণ্ঠে পরিয়ে দেয় ওটা, তারপর গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে।

নূরী ওকে বাধা দেয় না, মাথা রাখে বনহুরের বুকে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয়।

অনেক দুঃখ-বেদনা আর মনোকষ্ট নিয়ে রহমান দলবলসহ ফিরে আসে আস্তানায়। কিন্তু আস্তানায় ফিরে যখন শুনতে পেল, সর্দার জীবিত আছেন এবং তিনি তার পূর্বেই ফিরে এসেছেন তখন আনন্দে আত্মহারা হলো। আনন্দের আতিশয্যে ছুটে গিয়ে সর্দারকে বুকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বললো—সর্দার.......আপনি জীবিত আছেন!

বনহুরও নিজেকে অতিকষ্টে সংযত রেখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—রহমান, খোদার অসীম দয়া আর তোমাদের অফুরন্ত ভালবাসা আমাকে ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে।

সর্দারের বুকে বুক মিলিয়ে রহমান অসীম আনন্দ আর তৃপ্তি বোধ করে! এতো খুশি বুঝি কোনোদিন হয়নি সে তার জীবনে।

বনহুরের আস্তানা আবার উচ্ছল আনন্দে ভরে উঠে।

হাসি আর গানে মুখর হয়ে উঠে নূরী।

এতো আনন্দ আর খুশি নূরীর জীবনে এই প্রথম। কয়েকদিন নূরী আর বনহুর আস্তানায় মেতে রইলো—কখনও বা ঝরনার ধারে, কখনও জঙ্গলে, কখনও বা পাহাড়ের উপরে, কখনও ঘোড়ায় চেপে দু'জন দু'জনাকে নিয়ে আত্মহারা।

বনহুর বসে থাকে কোনো উঁচু পাথরে, নূরী ফুলে ফুলে ফুলরাণী সেজে নাচ দেখায়। কখনও নাগিনীকন্যা রূপ, কখনও ভীল বালা সেজে। বনহুর মৃদু মৃদু হাসে, কখনও বা হাত তালি দিয়ে নূরীকে উৎসাহ দেয়। কোনো

কোনোদিন উঁচু পাহাড়ে উঠে দু'জন হাত ধরে ধরে চলতে থাকে। গান গায় নূরী, বনহুর শীস দেয়—অপূর্ব এক অনুভূতি নাড়া দিয়ে উঠে নূরীর মনে।

বনহুরকে পেয়ে নূরীর জীবন সার্থক হয়।

বনহুর আর নূরী একদিন পাহাড়িয়া অঞ্চলের ধার ধরে কান্দাই-এর জঙ্গলে ফিরছিলো। তাজের লাগাম ধরে এগুচ্ছিলো বনহুর।

নূরী চলেছিলো তার ঠিক পাশে পাশে।

নূরীর পরনে ঘাগ্‌ড়া, গায়ে কামিজ, চুলগুলো বেণী করে কাঁধের দু'পাশে ঝুলানো। নূরী চঞ্চল হরিণীর মত ছুটে ছুটে চলছিলো।

বনহুর আপন মনে চলছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে দূরে ভীল পল্লীটার দিকে।

আর কিছুটা পথ এগিয়ে ওরা দু'জন অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসবে, সন্ধ্যা হয় হয় অবস্থা—দ্রুত পা চালাচ্ছিলো বনহুর আর নূরী।

এমন সময় একটা ছোট্ট বালকের কান্নার শব্দ ভেসে আসে ভীল পল্লী থেকে, করুণ সে কান্নার আওয়াজ—বাপু....বাপু.....হামার বাপু কই গেলো....বাপু.....

থমকে দাঁড়িয়েছিলো বনহুর, মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে গেলো, তাকালো সম্মুখে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ভীল পল্লীর দিকে। বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো একটি কচিমুখ—সরল-সচ্ছ দু'টি চোখ। ব্যাকুল কণ্ঠে সে যেন ডাকছে—আব্বু, আব্বু, তুমি কোথায় আব্বু.....

নূরী বনহুরের আনমনা ভাব লক্ষ্য করে বললো—কি ভাবছো হুর?

কিছু না! চলো নূরী যাই.....

জানি তুমি যা ভাবছো!

সত্যি কতদিন নূরকে দেখিনি, তাই....

বেশ তো, আজ গিয়ে ওকে দেখে এসো। আর শোনো, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। আমিও কতদিন আমার মনিকে দেখিনি। নূরীর কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে। একটু থেমে বলে—চলো না হুর, আজ রাতেই যাবো সেখানে!

কিন্তু তোমাকে নিয়ে অসুবিধে হবে নূরী।

যতো অসুবিধেই হউক শোনবো না তোমার কোনো কথা। আমাকে নিয়ে যেতেই হবে তোমাকে।

নূরী, বড্ড অবুঝ হচ্ছো।

না, আমি অবুঝ নই। বলো তবে কেন তুমি মনিকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে মনিরা আপাকে দিলে? বলো—বলো কেন মনিকে কেড়ে নিলে আমার বুক থেকে.....নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো উচ্ছ্বসিতভাবে।

বনহুর নূরীকে কাছে টেনে নিলো, স্নেহভরা কণ্ঠে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—দুঃখ করো না নূরী, মনি তো তোমারই।

না, আমার নয়। আমার হলে সে আমার কাছেই থাকতো। তুমি তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে.....

নূরী, লক্ষ্মীটি কেঁদো না।

বলো, মনির মতো আমাকেও একটি শিশু এনে দেবে?

হাসলো বনহুর মুখ টিপে, তারপর শান্ত কণ্ঠে বললো—দেবো।

বনহুরের কথায় আশ্বস্ত হলো নূরী—সে জানে, বনহুর কখনও মিথ্যা কথা বলে কাউকে সান্ত্বনা দেয় না। যা সে বলে তাই করে, জীবন দিয়েও পূর্ণ করে বনহুর।

নূরীর মুখ দীপ্ত হয়ে উঠলো।

বনহুর খুশি হলো মনে মনে, এবার সে নূরীকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে নিজেও চেপে বসলো। তাজ প্রভুর ইংগিত বুঝতো, বনহুর চেপে বসতেই উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

কান্দাই আস্তানায় পৌঁছে নূরীকে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নামিয়ে নিয়ে বললো বনহুর—তুমি থাকো নূরী, আমি মনির সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসবো।

যাও, কিন্তু সাবধানে যেও।

বনহুর লাফ দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো, হাত তুলে বললো—খোদা হাফেজ।

লাগাম টেনে ধরতেই তাজ সম্মুখের পা দু'খানা উঁচু করে চিঁহি চিঁহি করে উঠলো, তারপর ছুটলো উল্কাবেগে।

বনহুর যখন তাজের পিঠে চেপে কান্দাই শহর অভিমুখে চলেছে তখন সমস্ত পৃথিবী নিদ্রায় অচেতন। নির্জন পথে শুধু জেগে উঠছে তাজের মুখের শব্দ খট্ খট্ খট্। পথের দু'পাশে শাল আর দেবদারু গাছের ফাঁকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে রাতজাগা পাখীর থমথমে কণ্ঠ। আকাশে অসংখ্য তারার মালা, বাতাস বইছে এলোমেলো।

তাজের পিঠে উল্কাবেগে ছুটছে বনহুর।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বনহুর পৌঁছে গেলো চৌধুরী বাড়ির অদূরে।

গভীর নিস্তব্ধ রাত।

তাজের পিছ থেকে নেমে পড়লো বনহুর। তারপর পিছন প্রাচীর টপ্‌কে প্রবেশ করলো ভিতর বাড়িতে। চুপি চুপি পাইপ বেয়ে কৌশলে উঠে গেলো উপরে। যে পথে বনহুর মনিরার ঘরে প্রবেশ করতো, আজও সেই পথে প্রবেশ করে তাকায় বনহুর কক্ষমধ্যে। ডিম্‌লাইটের আলোতে বনহুর স্পষ্ট দেখতে পায়—মনিরা তার বিছানায় নিদ্রায় অচেতন। বুকের উপরে পড়ে আছে একখানা হাত, হাতখানার মধ্যে একটি ছবি রয়েছে।

বনহুর নিকটবর্তী হয়ে ঝুঁকে মনিরার হাতের মধ্য থেকে অতি সন্তর্পণে ছবিখানা তুলে নেয়, বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দেখে—সেটা তারই ছবি। অনুশোচনা আর ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠে তার হৃদয়, চোখ দুটো ছলছল করে উঠে, অপরাধীর মত সরে দাঁড়ায়। আবার বনহুর ফিরে তাকায় মনিরার নিদ্রিত মুখমণ্ডলের দিকে। নিজকে স্থির রাখতে পারে না সে, বসে পড়ে মনিরার পাশে, দক্ষিণ হস্তখানা রাখে ওর কপালে।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে যায় মনিরার। আচম্‌কা জেড়ে উঠে স্বামীর স্পর্শে। নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারে না।

বনহুর মনিরার বিস্ময় ভাব লক্ষ্য করে বলে—মনিরা, আমি এসেছি! ভালো করে তাকায় বনহুর মনিরার মুখের দিকে, কেমন যেন রুক্ষ আর করুণ লাগছে!

বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় দু'টি বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে।

সম্বিৎ ফিরে আসে মনিরার, অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে—কেন, এলে তুমি? যাও, চলে যাও। মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করে।

বনহুর আবেগভরা কণ্ঠে ডাকে—মনিরা!

তুমি আমার নাম ধরে ডেকো না। আমি তোমার কেউ নই।

ক্ষমা করো মনিরা। তোমার অপরাধী স্বামীকে ক্ষমা করো।

মনিরা তখন বনহুরের পাশ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অনেকগুলো দিনের জমানো ব্যথা আজ ঝরে পড়ছে বর্ষাধারার মতো তার দু'নয়ন বেয়ে।

বনহুর মনিরার দিকে এগিয়ে যায় যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো, কোমল কণ্ঠে বলে—মনিরা, আজ নতুন নয়—তুমি তো জানো, আমার কত কাজ! কথাটা বলে বনহুর মনিরাকে ধরতে যায়।

মনিরা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস করে উঠে—না, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

মনিরা।

কোনো কথাই আমি শুনতে চাই না তোমার।

মনিরা শোনো।

বলছি তুমি চলে যাও। আর কোনোদিন তুমি আসবে না আমার ঘরে।

ক্ষমা করো লক্ষ্মীটি!

না। আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। কোনো স্বামী এমনি করে দিনের পর দিন ভুলে থাকে তার স্ত্রীকে? কোনো পিতা সন্তান ত্যাগ করে চলে যায় দূরে—বহু দূরে? বলে, বলো—বলো কোনো ব্যক্তি এমনি নির্মম আর নিষ্ঠুর হয়? ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও আমাকে——মনিরা দাঁত দিয়ে বনহুরের হাত কামড়ে দেয়। নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ওর জামার অংশ।

বনহুর তবু মনিরাকে মুক্ত করে দেয় না, ব্যথা-করুণ এক-খণ্ড হাসি ফুটে উঠে বনহুরের ঠোঁটের কোণে, বলে—যা খুশি করো, কামড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলো, আমি বাধা দেবো না তোমাকে।

মনিরার দাঁতের আঘাতে বনহুরের হাত কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। সুন্দর বলিষ্ঠ লোমশ বাহুটা রাঙা হয়ে উঠে, তবু নীরব বনহুর। দীপ্ত হাস্যোজ্জ্বল তার মুখমণ্ডল।

সরে দাঁড়ায় মনিরা।

বনহুর হাতখানা রাখে পাশের চেয়ারের উপর।

হঠাৎ মনিরার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বনহুরের হাতের উপর, চমকে উঠলো মনিরা—রক্তে লাল হয়ে গেছে বনহুরের হাত-খানা। কিছুতেই নিজকে স্থির রাখতে পারলো না, ছুটে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো স্বামীর বুকে।

বনহুর মনিরাকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলো।

মনিরা ওর রক্তরাঙা হাতখানা চোখের সম্মুখে তুলে ধরে কেঁদে উঠলো—একি করেছি আমি!

মনিরা, এ ব্যথা তোমার বুকের ব্যথার চেয়ে অনেক কম। আমি জানি, সব বুঝি মনিরা কিন্তু আমি পারি না তোমাকে খুশি করতে। তাই আমাকে তুমি ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলো, আমি তোমার দেওয়া কষ্ট নীরবে গ্রহণ করবো......

না না,. এ আমি কি করেছি! এ আমি কি করেছি! স্বামীকে খাটের উপর বসিয়ে দিয়ে ছুটে যায় মনিরা, ঔষধ এনে ক্ষতে লাগিয়ে কাপড় জড়িয়ে বেঁধে দেয় যত্ন করে। তারপর স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলে—এতটা কেটে গেছে তবু তুমি একটুও শব্দ করোনি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো না যেন!

মনিরা! আবেগভরা কণ্ঠস্বর বনহুরের।

মনিরা ভুলে যায় সব মান-অভিমান, শান্ত কণ্ঠে বলে—বলো?

নূর কোথায় মনিরা?

মায়ের ঘরে ঘুমাচ্ছে।

ওকে দেখতে পাবো না একবার?

পাবে! ওগো পাবে! নূর যে তোমারই সন্তান।

মনিরা, নূর কত বড় হয়েছে?

বেশ বড় হয়েছে। পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো।

আঃ কি আনন্দ হচ্ছে আমার। নূর পড়াশোনা করে মানুষের মত মানুষ হবে——

মনিরা বলে উঠে—ও সব সময় তোমার কথা বলে।

উচ্ছল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে বনহুর, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—কি বলে সে?

বলে, আম্মি আমার আব্বু কোথায়? কবে আসবে, কখন আসবে, এমনি আরও কত প্রশ্ন করে।

তুমি তাকে কি জবাব দাও মনিরা?

নূর যখন তোমার কথা জিজ্ঞেস করে তখন আমি পারি না তার প্রশ্নের জবাব দিতে। কান্না পায় আমার, কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। বলো কি জবাব দেবো?

বলবে তোমার আব্বু মরে গেছে....

বনহুরের কথা শেষ হয় না, মনিরা তার মুখে হাতচাপা দেয়।

বনহুর মনিরার হাতখানা দক্ষিণ হস্তের মুঠায় চেপে ধরে বলে—তোমার জীবনে হয়তো বেঁচে থাকতে পারি কিন্তু নূরের জীবন থেকে আমি মরে যেতে চাই মনিরা।

অমন অমঙ্গলজনক কথা তুমি বলো না।

মনিরা! আমার মনিরা!

মনিরা তখন স্বামীর প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে চোখ দুটো বন্ধ করে।

❑

ঘুমন্ত নূরের কপালে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় বনহুর। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে পুত্রের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম পাশের কক্ষে নামাজ পড়ছিলো, সেই ফাঁকে মনিরা স্বামীকে নিয়ে প্রবেশ করেছিলো মামীমার কক্ষে। ভোর হবার পূর্বেই বনহুর উঠে পড়েছিলো, কান্দাই নগর জনমুখর হয়ে উঠার পূর্বেই সে ফিরে যাবে তার আস্তানায়। নূরকে দেখেই সে চলে যাবে।

বনহুর আর মনিরা ফিরে আসে নিজের ঘরে।

বিদায় মুহূর্তে বনহুর মনিরাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলে—মনিরা, তুমি যেন আমাকে ভুল বুঝবে না। যখনই সুযোগ পাবো,চলে আসবো তোমার কাছে।

সত্যি আসবে তো?

আসবো।

ঠিক সেই সময় শোনা যায় নূরের কণ্ঠ—আম্মি, আম্মি....

মনিরা স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ায়—আসছি বাবা।

ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে বনহুর মুক্ত জানালা দিয়ে।

নূর মায়ের কক্ষে প্রবেশ করে বললো—আম্মি, কে যেন কথা বললো তোমার ঘরে?

কই, কেউ না তো বাবা! এসো আমার কাছে। মনিরা সন্তানকে টেনে নেয় কোলের কাছে। কিন্তু তার দৃষ্টি চলে যায় মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরে। ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করে নিচের দিকে।

নূর বলে—কি দেখছো আম্মি?

কিছু না। চলো তোমার হাতমুখ ধুয়ে দিইগে।

মনিরা সন্তানসহ চলে যায় বাথরুমের দিকে।

ওদিকে বনহুরের অশ্ব তখন কান্দাই শহর অতিক্রম করে আস্তানা অভিমুখে এগিয়ে চলেছে।

ফিরে এলো বনহুর আস্তানায়।

তাজের পিঠ থেকে নেমে পড়তেই দু'জন অনুচর তাজের লাগাম ধরে তাজকে অশ্বশালার দিকে নিয়ে গেলো।

বনহুর এগিয়ে চললো সুড়ঙ্গপথে নিজ বিশ্রামাগারের দিকে।

বিশ্রামাগারে প্রবেশ করতেই নূরী এসে দাঁড়ালো—হুর, এসে গেছো? মনিরা আপা আর নূর কেমন আছে?

বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে গুলিভরা রিভলভারখানা রাখলো টেবিলে, তারপর আসনে উপবেশন করে বললো—ভালই আছে ওরা।

হঠাৎ নূরীর দৃষ্টি বনহুরের হাতের ব্যাণ্ডেজে গিয়ে আটকে পড়লো, তাড়াতাড়ি হাতখানা নিজের হাতের উপর তুলে নিয়ে বললো—কি হয়েছে? কি করে কেটে গেলো তোমার হাতখানা?

চট্ করে কোনো জবাব দিতে পারলো না বনহুর, একটু ভেবে বললো—কেটে গেছে।

কেটে গেছে! কিন্তু কি করে কাটলো?

ও কথা বলো না, হঠাৎ কেমন করে কাটলো একটুও টের পাইনি।

নূরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—তোমার হাতের ব্যাণ্ডেজখানা রক্তে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে আর বলছো কেমন করে কেটে গেলো একটুও টের পাওনি? কি ভয়ঙ্কর মানুষ তুমি?

নূরীর কথায় হেসে বললো বনহুর—নতুন করে আজ এটা আবিষ্কার করলে নূরী?

অভিমান ভরা গলায় বললো নূরী—জানি তুমি অদ্ভুত মানুষ কিন্তু এতোখানি সংজ্ঞাহীন তা জানতাম না।

বনহুর বললো—সামান্য কেটেছে, এ নিয়ে ভাবার কিছু নেই নূরী। চলো ঝরণার ধারে যাই। মুক্ত বাতাসে শরীরটা শীতল হবে।

এমন সময় কক্ষের বাইরে কারো পদশব্দ শোনা যায়।

পরক্ষণেই শোনা যায় রহমানের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—সর্দার।

বনহুর বলে উঠলো—এসো। ভিতরে এসো।

হন্তদন্ত হয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে রহমান—পিছনে কায়েস আর গোরী আস্তানার একজন অনুচর—নাম তার সোনা মিয়া। রহমান, কায়েস এবং সোনা মিয়ার চোখেমুখে উত্তেজনার ভাব বিদ্যমান।

বনহুর কিছু বলার পূর্বেই বলে রহমান—সর্দার, সর্বনাশ হয়েছে, আমাদের গোরী আস্তানা লুট হয়েছে।

বনহুর আসনে বসেছিলো রহমানের কথা শুনে দ্রুত উঠে দাঁড়ায়, চোখেমুখে ফুটে উঠে বিস্ময় আর ক্রুদ্ধ ভাব। হুঙ্কার ছাড়ে—গোরী আস্তানা লুট হয়েছে?

এবার কথা বললো সোনা মিয়া—হাঁ সর্দার।

বনহুরের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বের হয়, কঠিন হয়ে উঠে তার সুন্দর দীপ্ত মুখমণ্ডল বলে উঠে—কিভাবে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো সোনা?

সর্দার, আজ গভীর রাতে একদল দুধর্ষ দস্যু হামলা দিয়ে সব লুট করে নিয়ে গেছে আর কয়েকজনকে হত্যাও করেছে তারা।

আর তোমরা কি করছিলে?

আচম্বিতে আক্রমণ করায় আমরা প্রস্তুত ছিলাম না সর্দার।

সোনা, জানো না আমার আস্তানার অনুচরগণ কোনো সময় অপ্রস্তুত থাকতে পারে না? গোরীর সর্দার বীর সিং কোথায় ছিলো?

সোনা মাথা নিচু করে রইলো, কোন জবাব দিলো না।

বনহুর পুনরায় গর্জে উঠলো-বীর সিং কোথায় ছিলো কাল রাতে?

সর্দার----

বলো কি বলতে চাও?

বীর সিং তার বিশ্রামাগারে ছিলো।

বিশ্রামাগারে নিদ্রায় অচেতন ছিলো?

না সর্দার।

তবে?

সোনা মিয়া অসহায় চোখে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, কিছু যেন বলতে চায় কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

বনহুর ধমকে উঠলো—নেকামি করছো কেন? যা বলার বলো। আমি আজই গোরী আস্তানা অভিমুখে রওনা দেবো। তারপর সব শুনবো নিজ কানে।

এবার বললো সোনা মিয়া—বীর সিং নেশা পান করে বিভোর হয়েছিলো সর্দার।

এর পূর্বেও আমি শুনেছি বীর সিং নেশাই পান করে না, আরও এমন অনেক কাজ সে করে যা আমার অগোচর নেই। একবার নয়, কয়েকবার আমি তাকে ক্ষমা করেছি কিন্তু এবার আমি তার সমুচিত শাস্তি দান করবো।

একসঙ্গে রহমান এবং সোনা মিয়া কেঁপে উঠলো। শিউরে উঠলো তাদের হৃদয়, জানে তারা—সর্দারের শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড।

কম্পিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সোনা মিয়া সর্দারের দিকে।

বনহুর বললো—রহমান গোরী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি গোরীর সর্দার বীর সিং এবং আমার আস্তানা লুটকারীদের উপযুক্ত সাজা দেবো।

নূরীও শিউরে উঠলো, একটা আতঙ্কের ছায়া ছিলো তার মুখে। না জানি আবার হুর কোন্ বিপদের সম্মুখীন হয় কে জানে।

সোনা মিয়া আর রহমান কুর্ণিশ জানিয়ে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

রহমান সংকেতধ্বনি করে আস্তানার সমস্ত অনুচরকে একত্রিত করলো, তারপর জানিয়ে দিলো সর্দারের আদেশটা।

রহমান আর সোনা মিয়া বেরিয়ে যেতেই বনহুর চিন্তিতভাবে পায়চারী শুরু করলো। তার মুখমণ্ডলে গভীর উদ্বিগ্নতার রেখা ফুটে উঠলো।

নূরীও এই মুহূর্তে কোনো কথা বলার সাহসী হলো না। একটু পূর্বেই যে বনহুরের সঙ্গে সচ্ছ স্বাভাবিকভাবে আলাপ-আলোচনা করছিলো এখন সে যেন সরে গেছে অনেক দূরে। বনহুরের দিকে তাকিয়ে রইলো নূরী নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে।

❑

গোরী পার্বতের গহ্বরে ছিলো বনহুরের গোরী আস্তানা। এখানে বনহুরের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন অনুচর থাকতো। এই সব অনুচরকে পরিচালনা করার জন্য ছিলো সর্দার বীর সিং—এক হিন্দু লোক।

কান্দাই এর দক্ষিণে প্রায় একশত মাইল দূরে এই গোরী পর্বত। গোরী হিন্দুপ্রধান দেশ, তাই গোরী আস্তানার বনহুরের প্রায় সবগুলো অনুচর হিন্দু ছিলো, দু'চারজন ছিলো মুসলমান।

সোনা মিয়া তাদেরই একজন।

হিন্দু হলেও গোরী আস্তানার অনুচরগণ সবাই ছিলো বনহুরের অত্যন্ত বিশ্বাসী আর অনুগত। গোরী পর্বত এলাকার বহু লোকের বাস ছিলো। এইসব অঞ্চলের লোকজন ছিলো অত্যন্ত দুর্দান্ত আর জঘন্য। এরা সুযোগ পেলেই দলবদ্ধ হয়ে গোরী নগরে প্রবেশ করে নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করতো এবং তাদের সব লুটপাট করে নিতো। নারীদের হরণ করে নিয়ে যেত। বনহুর এইসব লম্পট শয়তানকে দমন করার জন্যই গোরী পর্বতে একটি আস্তানা গড়ে তুলেছিলো।

বনহুরের এই আস্তানার নাম ছিলো গোরী আস্তানা। বীর সিং এই আস্তানার সর্দার বানিয়ে বনহুর নিশ্চিন্ত ছিলো।

কিন্তু কিছুদিন হলো বীর সিং ভিতরে ভিতরে নারী ও নেশা পানে মেতে উঠেছিলো। প্রায়ই সে এখানে-সেখানে অন্যায়ভাবে হানা দিয়ে নারী হরণ করে আনতো এবং চালাতো ব্যভিচারী অত্যাচার।

বনহুরের কানে তেমনভাবে এ সংবাদ না গেলেও কিছুটা সে জানতে পেরেছিলো। কিন্তু যখন বনহুর বীর সিং সম্বন্ধে জেনেছিলো তখন সে কিউকিলা হত্যা ব্যাপার নিয়ে আত্ম-ভোলা হয়ে পড়েছিলো।

আজ বনহুর যখন গোরী আস্তানা লুটের সংবাদ পেলো তখনই তার মনে পূর্বকথা স্মরণ হলো এবং অনুমানে বুঝে নিলো বীর সিং এর জন্যই আজ এই ঘটনা ঘটেছে।

বনহুর তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর এবং রহমানসহ গোরী আস্তানায় এসে হাজির হলো।

বীর সিং-এর হৃদয় কেঁপে উঠলো সর্দারের আগমনে।

বনহুর আস্তানায় পৌঁছতেই তার প্রত্যেকটা অনুচর এসে করজোরে দণ্ডায়মান হলো। সকলেই চোখেমুখে এক ভয় বিহ্বল ভাব।

এক পাশে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছে বীর সিং ঠিক অপরাধীর মত।

বনহুর আসনে উপবেশন না করে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাকালো তার প্রত্যেকটা অনুচরের দিকে। দৃষ্টি এসে স্থির হলো বীর সিং-এর মুখে।

বীর সিং তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিলো হয়তো, বনহুর বজ্রকঠিন কণ্ঠে গর্জে উঠলো—বীর সিং।

চমকে মুখ তুললো বীর সিং, শুষ্ক কণ্ঠে বললো—সর্দার।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে?

সর্দার, আমি—আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম---

বীর সিং-এর কথার মাঝখানে বলে উঠে বনহুর—আর সেই সুযোগে গোরীদস্যু হানা দিয়ে সব লুটে নিয়ে গেছে, তাই না?

সর্দার, হাঁ—সেই মতই হয়েছে।

বীর সিং, আমি গোরী আস্তানায় না এলেও তোমার সম্বন্ধে সব অবগত আছি। তুমি কখন কোন মুহূর্তে কি করছো সব আমি জানি।

সর্দার, আপনি হয়তো আমার সম্বন্ধে-----

ভুল শুনেছি তাই না?

মাথা নত করে থাকে বীর সিং কোনো জবাব দেয় না।

বনহুর বুট দিয়ে মাটিতে আঘাত করে—বীর সিং, তোমার নিজের মুখে শুনতে চাই, তুমি গতরাতে কোথায় ছিলে এবং কি করছিলে? যার জন্য গোরী দস্যু আমার আস্তানায় হানা দেবার সুযোগ পেলো?

আস্তানায় দরবার স্থান থমথমে নীরব। বনহুরের গম্ভীরকণ্ঠের প্রতিধ্বনি গোরী পর্বতের গুহাকে প্রকম্পিত করে তোলে। বীর সিং নিজকে রক্ষা করার উপায় খুঁজে। সে ভাবতেও পারেনি সর্দার স্বয়ং এসে হাজির হবে। বিনীত করুণ কণ্ঠে বললো বীর সিং—সর্দার, আমি আস্তানার বাইরে গিয়েছিলাম।

আবার মিথ্যা কথা? বনহুর উচ্চকণ্ঠে ধমক দিলো।

সোনা মিয়া তার একজন অনুচরকে ইঙ্গিত করলো।

অনুচরটি বেরিয়ে গেলো তৎক্ষণাৎ।

একটু পরে ফিরে এলো লোকটা আরও দু'জন অনুচর ও একটি তরুণীসহ। অনুচরদ্বয়ের নাম দেলওয়ার আর বলরাম। তরুণীর দু'বাহু দু'জনা ধরে ছিলো শক্ত করে।

বনহুর তাকালো তরুণীর দিকে।

তরুণী গোরীবাসিনী তাতে সন্দেহ নেই। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হবে। সুন্দরী বটে মাথায় চুল এলোমেলো, ছিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত বসন। জামার অংশ ছিড়ে গেছে স্থানে স্থানে, আঁচলখানা ভুলুণ্ঠিত। চোখে কালিমা পড়েছে মুখে কয়েক স্থানে ক্ষত চিহ্ন। উন্মাদিনীর মত চাহনী।

সোনা মিয়া, দেলওয়ার ও বলরাম তরুণীটি সহ যখন দরবার কক্ষে প্রবেশ করলো তখন দরবারকক্ষই শুধু কেঁপে উঠলো না, কেঁপে উঠলো দরবারকক্ষের প্রতিটি অনুচরের হৃদয়।

বীর সিং-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, ফাঁসীর মঞ্চের আসামীর মত রক্তশূন্য দেখাচ্ছে তাকে। একবার তরুণীর দিকে তাকিয়ে মাথাটা নত করে নিলো।

বনহুর তরুণীর পা থেকে মাথা অবধি দেখে নিলো নিপুণ দৃষ্টি মেলে।

তরুণী দাঁত দিয়ে অধর দংশন করছিলো আর ক্রুদ্ধ নজরে তাকাচ্ছিলো অদূরে দণ্ডায়মান বীর সিং-এর দিকে।

বনহুর বললো—বীর সিং, কে এই তরুণী?

বীর সিং বাধ্য হয়ে তাকালো আবার তরুণীর দিকে কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারলো না, সে ভাবতেও পারেনি, সর্দার আস্তানা লুটের সংবাদ পেয়ে চলে আসবে আর এসে তারই বিচার নিয়ে মেতে উঠবে। বীর সিং পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চুপ হয়ে।

বনহুর গর্জে উঠলো আবার—বীর সিং, জবাব দাও কে এই তরুণী?

তরুণীই চিৎকার করে বলে উঠলো—আমি, আমি গোরীর এক ব্রাহ্মণ কন্যা। বাবাকে বন্দী করে মাকে হত্যা করে ঐ শয়তান আমাকে হরণ করে এনেছে। আমার সবকিছু ঐ শয়তান কেড়ে নিয়েছে----আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে ও ---

বনহুর নিজ দৃষ্টিটা ক্ষণিকের জন্য নত করে নেয়, হয়ত বা অনুচরদের সম্মুখে তার লজ্জাবোধ হয়। তারপর ফিরে তাকায় বীর-সিং এর দিকে—ওর কথা সত্য না মিথ্যা?

বীর সিং মরিয়া হয়ে ঢোক গিলে জবাব দিতে চেষ্টা করে—সর্দার, ও মিথ্যা বলছে---

খবরদার মিথ্যা বলো না বীর সিং, আমার আদালত নেই যে তোমার সত্য উদ্ঘাটনের জন্য উকিল নিযুক্ত করবো। আমার কারাগার নেই যেখানে তোমাকে বন্দী করে রাখবো। আমার বিচার বাদী আর বিবাদী শুধু দু'জনাকে নিয়ে। বিচার শেষে হয় মুক্তি নয় মৃত্যু।

চমকে মুখ তোলে বীর সিং—সর্দার, আমাকে ক্ষমা করুন।

ক্ষমা! হাঃ হাঃ হাঃ, অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর। তারপর হাসি থামিয়ে বললো—যে অপরাধ তুমি করেছো তার ক্ষমা নেই বীর সিং। গোরী আস্তানা লুট হয়েছে আফসোস নেই, কিন্তু ঐ অসহায় তরুণীর ইজ্জৎ লুটে নেবার কি অধিকার ছিলো তোমার? বীর সিং তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

বীর সিং ছুটে এসে বনহুরের পা দু'টি চেপে ধরলো—আমাকে ক্ষমা করুন সর্দার---

বনহুর বাম হস্তে বীর সিং-এর চুল মুঠি করে ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ হস্তে ছোরাখানা সমূলে প্রবেশ করিয়ে দিলো ওর তলপেটে।

তীব্র একটা আর্তনাদ করে ভূতলে পড়ে গেলো বীর সিং। তাজা লাল টক্‌টকে রক্তে ভিজে উঠলো গোরী আস্তানার মেঝের খানিকটা অংশ। বলির পাঠার মত চীৎ হয়ে পড়ে ছট্‌ফট করতে লাগলো সে।

আস্তানার প্রত্যেকটা অনুচর থরথর করে কেঁপে উঠলো কিন্তু কারো মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের হলো না।

তরুণীটি বীর সিং-এর অবস্থা দেখে প্রথমে ভীত হয়ে পড়েছিলো, পরে হেসে উঠে খিল খিল করে। বীর সিং-এর দেহটা যখন নীরব হয়ে গেলো তখন তরুণী এগিয়ে গিয়ে বনহুরের পা আঁকড়ে ধরলো—আপনি দেবতা না মানুষ? আপনি কে? আমার রক্ষণকারী আপনি---

বনহুর তরুণীকে নিজ হাতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললো—আমি একজন মানুষ। বলো এখন আমি তোমাকে কোথায় পৌঁছে দেবো?

তরুণীর চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠলো, বললো—আমার বাবা ব্রাহ্মণ। আমাকে বাবা গ্রহণ করলে সমাজ তাঁকে ত্যাগ করবে। এখন আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না কোথায় যাবো। বাবাকে সমাজ স্থান না দিলে না খেয়ে মরবেন তিনি। কারণ আমার বাবা পূজোরী ব্রাহ্মণ। এখানে-সেখানে পূজো-পার্বণ করে যা পান তা দিয়েই তাঁর জীবন রক্ষা পায়।

তোমার বয়স তো কম মনে হয় না কিন্তু আমি জানি হিন্দু সমাজের মেয়েদের কম বয়সেই বিয়ে হয়।

আপনি যা বলেছেন সত্য, কিন্তু আমাদের সমাজে কন্যাদায় অত্যন্ত কঠিন। অর্থের অভাবে আজও আমার বিয়ে হয়নি।

বনহুর একটু শব্দ করলো—হুঁ। তারপর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—তরুণীকে নিয়ে যাও। ওকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাওগে।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান তরুণীসহ বেরিয়ে যায়।

বনহুর এবার তার অন্যান্য অনুচরকে লক্ষ্য করে বললো—তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও, আমি গোরীদস্যুদের সমুচিত শাস্তি দেবো, তারপর ফিরে যাবো কান্দাই।

কথাটা বলে তখনকার মত বনহুর দরবারকক্ষ ত্যাগ করলো।

❑

রহমান আর বনহুর গোরী আস্তানায় বিশ্রামাগারে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলো। বনহুর বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বালিশে ঠেশ দিয়ে সিগারেট পান করছিলো। মুখ খানা এখন অনেকটা প্রসন্ন, শান্ত।

রহমান তার শয্যার পাশে একটি আসনে উপবিষ্ট।

বনহুর বললো—কি নাম বললে মেয়েটির?

শিবানী। বললো রহমান।

আপন মনে উচ্চারণ করলো বনহুর—শিবানী। ব্রাক্ষণকন্যা শিবানী। রহমান, শিবানীকে তার পিতার নিকটে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেছো?

পৌছে দেওয়া কঠিন হবে না সর্দার, কিন্তু---

কিন্তু কি? থামলে কেন বলো?

সর্দার, শিবানীকে তার পিতা গ্রহণ করলে সমাজ সেই বৃদ্ধাকে ত্যাগ করবে। শিবানীর বাবা পূজোরী ব্রাক্ষণ কাজেই সমাজ ছাড়া বাঁচার কোনো পথ নেই।

রহমানের কথা শুনে একটু হেসে বললো বনহুর—রহমান, পৃথিবীটা অর্থের দাস। শিবানীর বাবার যদি প্রচুর অর্থ থাকে তাহলে সমাজ কেন, সমাজপতিরাও তাকে পূজো করবে। অর্থের প্রাচুর্যে ঢাকা পড়বে শিবানীর সব কলঙ্ক। তুমি বৃদ্ধ ব্রাক্ষণকে বহু অর্থ দিয়ে আসবে যেন তার অপরের কাছে হাত পাততে না হয়।

রহমান আর বনহুর যখন নির্জনে আলাপ হচ্ছিলো তখন শিবানী আড়াল থেকে সব শুনছিলো, সে স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছিলো বনহুর আর রহমানকে। কৃতজ্ঞতা শিবানীর মন ভরে উঠছিলো।

শিবানীর দেহে এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ড্রেস। মুখোভাব তখনের চেয়ে অনেকটা স্বাভাবিক। চুলগুলো খোঁপা করে বাঁধা। বনহুর আর রহমানের কথাগুলো তার মনে সান্ত্বনা এনে দিয়েছে অনেক।

বনহুরের কথায় বললো রহমান—সর্দার, আপনার আদেশ পালন করবো।

করবো নয় রহমান, এখনই তুমি তৈরি হয়ে নাও।

রহমান উঠে দাঁড়ালো, বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই বনহুর বললো— শোনো!

রহমান ফিরে তাকালো—বলুন সর্দার?

তোমাকে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সাজতে হবে রহমান না হলে লোকে সন্দেহ করবে। সাধু বাবাজী সেজে শিবানীকে পৌঁছে দেবে তার পিতার কাছে, বলবে দস্যুদের কবল থেকে তুমি তাকে উদ্ধার করে নিয়েছো। যাও, প্রয়োজনমত অর্থ নিয়ে যাও—দিয়ে এসো তাঁকে।

শিবানীর দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়—কে এই যুবক? নিশ্চয়ই এদের দলপতি হবে। যতই কঠিন ততই সুন্দর-কোমল ওর প্রাণ। শিবানীর মাথাটা ভক্তিভরে নত হয়ে আসে।

রহমান বেরিয়ে যায়।

শিবানীও সরে যায় আড়াল থেকে।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে রহমান, তাকে দেখলে সাধু বাবাজী ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। শুভ্র দাড়ি-গোঁফ আর ভ্রু জোড়া। পরনে গেরুয়া হরিনাম বস্ত্র। গলায় যজ্ঞোপবীত ললাটে শ্বেত চন্দনের রেখা। দক্ষিণ হস্তে লৌহ চিম্‌টা বাম হস্তে বিরাট একটি থলে।

সন্নাসী বেশি রহমান কক্ষে প্রবেশ করতেই উঠে দাঁড়ালো বনহুর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে রহমানের আপদমস্তক লক্ষ্য করে বললো—নিখুঁত হয়েছে সন্ন্যাসী বাবাজী। অর্থ নিয়েছো?

হাঁ সর্দার। বললো সন্যাসী বাবাজী।

বনহুর হাতে পর পর দুটো তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো দু'জন অনুচর বনহুরকে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো।

বনহুর বললো—ব্রাহ্মণ কন্যাটিকে নিয়ে এসো।

অনুচরদ্বয় বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে শিবানীসহ ফিরে এলো।

বনহুর বললো—বোন, এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তোমাকে তোমার পিতার নিকটে পৌঁছে দেবে। যাও।

শিবানী অশ্রু ছলছল নয়নে তাকালো বনহুরের দীপ্ত উজ্জ্বল অপূর্ব মুখমণ্ডলের দিকে। তারপর হঠাৎ বনহুরের পায়ের কাছে বসে প্রণাম করলো।

শিবানীসহ বেরিয়ে গেলো রহমান।

অনুচরদ্বয় অনুসরণ করলো রহমান আর শিবানীকে।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

শিবানীর চিন্তা লাঘব হলো, এবার বনহুর গোরী দস্যুদমনে চিন্তা করতে লাগলো। কিভাবে এদের সে শায়েস্তা করবে।

বেশিক্ষণ ভাববার জন নয় দস্যু বনহুর।

উঠে পড়লো সে আসন ত্যাগ করে।

দস্যু ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো, রিভলভারখানা পকেটে তুলে নিলো তারপর বেরিয়ে এলো আস্তানার বাইরে।

থমথমে রাত।

অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে আছে তাজ।

সর্দারকে আস্তানার বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখে দু'জন অনুচর মশাল হস্তে তাজের দু'পাশে এসে দাঁড়ালো।

বনহুর উঠে বসলো তাজের পিঠে।

তাজের জমকালো দেহের সঙ্গে দস্যু বনহুরের জমকালো ড্রেস মিলে এক হয়ে গেলো যেন।

প্রভুকে নিয়ে উল্কাবেগে ছুটলো তাজ।

গোরী দস্যু লালারাম দলবল নিয়ে প্রস্তুত সে টের পেয়ে গিয়েছিল দস্যু বনহুর এসে গেছে গোরী পর্বতের আস্তানায়। লালারাম দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অবগত ছিলো, জানে সে দস্যু বনহুর কতবড় ভয়ঙ্কর আর দস্যু সাংঘাতিক।

লালারাম ভাবতো সে নিজেও কম নয় এবং সেই মনোবল নিয়েই লালারাম দস্যু বনহুরের গোরী আস্তানায় হানা দিয়েছিলো।

গোরীর সর্দার বীর সিং নেশা আর নারী নিয়ে তখন মত্ত থাকায় আরও সুযোগ পেয়েছিলো লালারাম ইচ্ছামত সে হত্যা করেছিলো বনহুরের অনুচরদের আর লুট করে নিয়েছিলো অগাধ টাকাকড়ি আর সোনাদানা।

দস্যু লালারাম আর আড্ডায় দলবল নিয়ে পরামর্শ করছিলো এ আড্ডা ত্যাগ করে সরে পড়তে হবে। নইলে দস্যু বনহুর তাদের উপরে আক্রমণ চালাতে পারে।

লালারাম যখন তার অনুচরদের মধ্যে দাঁড়িয়ে চাপা কণ্ঠে বলছিলো—তোমরা আসর গুটিয়ে নাও। মালপত্র সব ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নাও। আজ রাতেই আমরা রওনা দেবো। দস্যু বনহুর গোরী পর্বতে এসে গেছে।

অনুচরদের মধ্যে একজন বলে উঠে—সর্দারজী দস্যু বনহুর এসে গেছে—এ সংবাদ কে জানালো আপনাকে?

আমাদেরই একজন গুপ্তচর। সে আরও জানিয়েছে দস্যু বনহুর তার আস্তানার সর্দার বীর সিংকে হত্যা করেছে।

সর্দারজী তাহলে তো এবার আমাদের আড্ডায় আক্রমণ চালাতে পারে?

পারে নয় মতিলাল কোন্ মুহূর্তে আক্রমণ চালিয়ে বসবে তার ঠিক নেই। কাজেই আমরা যত শীঘ্র পারি এখান থেকে সরে পড়বো।

সরে পড়ার সুযোগ তুমি আর পাবে না লালারাম। গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে ফিরে তাকালো সবাই, মুহূর্তে মরার মুখের মত রক্তশূন্য হয়ে পড়লো লালারাম ও তার দলবলের মুখ। তারা দেখতে পেল একটা অদ্ভুত জমকালো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার মুখে, তার দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার।

লালারাম অস্ত্রে হাত দিতে গেলে জমকালো মূর্তি বলে উঠলো–– খবরদার অস্ত্রে হাত দিও না।

লালারাম জমকালো মূর্তির দিকে তাকিয়েই বুঝতে পেরেছিলো কে এই অদ্ভুত মানুষ, তবু বললো––কে তুমি! কি চাও?

দস্যু বনহুর! আমি তোমার জীবন চাই।

মনে মনে শিউরে উঠলেও সাহস টেনে বললো––লালারাম––ও তুমি দস্যু বনহুর। আমার আড্ডার সন্ধান তুমি পেলে কি করে দস্যুসম্রাট?

দস্যু বনহুরের অজানা কিছুই নেই লালারাম। তোমার আড্ডার সন্ধানও আমার অজানা ছিলো না।

কি করে তুমি এই মৃত্যুকূপে প্রবেশ করলে।

অস্ত্রের ধারা পথ পরিষ্কার করে।

আমার অনুচরদের তুমি হত্যা করেছো দস্যুসম্রাট?

বাধ্য হয়ে, কারণ তারা আমাকে এখানে প্রবেশে বাধা দিচ্ছিলো। বলো লালারাম কোথায় তোমার লুণ্ঠিত সম্পদ যা আমার আস্তানা থেকে নিয়ে এসেছো?

লালারাম তার অনুচরদের আদেশ করলো––দস্যু বনহুরকে আক্রমণ করো। সঙ্গে সঙ্গে লালারাম সরে দাঁড়ালো।

বনহুর গুলি ছুঁড়লো কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো।

ততক্ষণে লালারামের অনুচরগণ দস্যু বনহুরকে আক্রমণ করে বসলো। অস্ত্র চালালো দস্যুসম্রাটকে লক্ষ্য করে।

বনহুর এক লাফে লালারামের সম্মুখে এসে তাকে পিছন থেকে গলা চেপে ধরে গুলি চালালো লালারামের অন্যান্য অনুচরকে লক্ষ্য করে।

গুলি খেয়ে এক একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো ভূতলে। ধড়ফড় করে মুত্যু বরণ করতে লাগলো। লালারামকে বামহস্তের চাপে কাবু করে ফেললো বনহুর। অনুচরগণ দলপতির করুণ অবস্থা এবং সঙ্গীদের নির্মম মৃত্যু লক্ষ্য করে যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। আড্ডায় পড়ে রইলো শুধু কয়েকটা মৃতদেহ আর লালারাম ও দস্যু বনহুর।

লালারাম আর দস্যু বনহুরে চললো ভীষণ লড়াই। বনহুরের হস্তে রিভলভার আর লালারামের হস্তে সূতীক্ষ্ণ ছোরা।

কেউ যেন কারো চেয়ে কম নয়।

লালারাম গোরী দেশের মানুষ, অসুরের মত শক্তি তার দেহে। যেমন হিংস্র তেমনি দুর্দান্ত। বনহুরের বুকে ছোরা বসিয়ে দেবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলো।

বনহুরের ইচ্ছা নয় লালারামকে এতো সকালে হত্যা করে। লালারামকে জীবিত বন্দী করে ওর কাছেই জেনে নেবে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার আস্তানা থেকে লুণ্ঠিত মালপত্র। তারপর নিহত অনুচরদের জীবনের বিনিময়ে প্রতিশোধ নেবে বনহুর তিল তিল করে।

লালারাম একবার ভূতলে পড়ে গেলো , সঙ্গে সঙ্গে বনহুর রিভলভারখানা চেপে ধরলো তার বুকে।

লালারাম ছোরা ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, হাত দু'খানা তুলে ধরলো মাথার উপরে।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে লালারাম। ঠোঁটের পাশ কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জামার স্থানে স্থানে ছিঁড়ে গেছে। হিংস্র জন্তুর মত ফোঁস ফোঁস করছে সে।

বনহুর রিভলভার ঠিক রেখে বললো—লালারাম এবার বলো কোথায় আমার আস্তানা থেকে লুণ্ঠিত মালপত্র কোথায় রেখেছো?

লালারাম দাঁত পিষে বললো—বলবো না।

বলবে না?

না।

বলতে হবে তোমাকে।

লালারাম তেমনিভাবে জবাব দিলো—আমি কিছুতেই আমার গোপন ভাণ্ডারের খোঁজ তোমাকে দেবো না।

সত্যি বলছো লালারাম?

নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলো লালারাম—হাঁ সত্য বলছি। আমার জীবননাশ করতে পারো কিন্তু আমার গোপন ভাণ্ডারের সন্ধান তুমি পাবে না দস্যুসম্রাট।

লালারাম এখনি তোমার প্রাণহীন দেহটা গড়িয়ে পড়বে ধূলির মেঝেতে। ঐ গোপন ভাণ্ডারের সম্পদগুলো কোনো কাজেই আসবে না।

না এলে আমি দুঃখ পাবো না। আমার অনুচরদের মধ্যে কেউ না কেউ এ সম্পদ পাবে আর সেই হবে দস্যু লালারামের আস্তানার সর্দারজী। আমি মরতে পারি কিন্তু আমার দল মরতে পারে না, কেউ না কেউ বেঁচে থাকবে। যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকবে আমার নাম---

লালারামের কথাগুলো বনহুরের হৃদয় স্পর্শ করলো। সত্যি বীরের মতই কথা বলেছে লালারাম। বনহুর সত্যিকারের বীরকে কোনদিন অমর্যাদা করে না, বরং তাকে উৎসাহী করে সে অন্তর দিয়ে।

বনহুরের হস্তের রিভলভার নত হয়ে এলো, হিংস্র মুখোভাব প্রসন্ন হয়ে এলো ধীরে ধীরে, বললো—লালারাম তোমার কথা শুনে আমি প্রীত হয়েছি। তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।

বনহুরের কথায় লালারামের চোখ দুটো নিভে এলো যেন, নিস্তেজ হয়ে এলো তার ধমনীর শিরা-উপশিরাগুলো। দস্যু বনহুর তাকে ক্ষমা করেছে।

লালারাম সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কৃতজ্ঞ হলো যেন, হঠাৎ বনহুরের পায়ে উবু হয়ে পড়তে গেলো ।

বনহুর লালারামকে হাত দু'খানা দিয়ে ধরে ফেলল, তারপর বুকে টেনে নিয়ে বললো—লালারাম গোরী আস্তানার সর্দার বীর সিং এর স্থানে আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠা করলাম। আজ থেকে তুমি আমার শত্রু নও—বন্ধু।

লালারাম আনন্দে আত্মহারা হলো যেন বললো—দস্যুসম্রাট, আপনি সত্যিই মহৎ। আমরা আপনার একটি নখের সমতুল্য নই। আজ আমি ধন্য, দস্যু বনহুর আমার শত্রু নয়—বন্ধু।

বনহুর যখন দস্যু লালারাম এর নিকট হতে ফিরে এলো আস্তানায় তখন রহমান তাকে কুর্ণিশ জানিয়ে শিবানীকে পৌছে দেবার সংবাদ জানালো।

বনহুর সবশুনে খুশি হলো। লালারাম সম্বন্ধেও সব বললো বনহুর রহমানের কাছে।

পরদিন লালারাম বনহুরের আস্তানা থেকে লুণ্ঠিত সমস্ত মালপত্র এবং তার নিজস্ব আরও মূল্যবান সম্পদ নিয়ে হাজির হলো বনহুরের গোরী আস্তানায়। উপঢৌকনস্বরূপ সব এনে দিলো দস্যুসম্রাটের সম্মুখে।

বললো লালারাম—আজ থেকে আমি আপনার অনুগত দাস হলাম।

গোরী আস্তানায় আনন্দ উৎসব বয়ে চললো।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট দস্যু বনহুর।

তার দক্ষিণ পাশে রহমান আর বামপাশে উপবিষ্ট দস্যু লালারাম।

লালারামের অনুচরদের মধ্যে কয়েকজন খেলা দেখাচ্ছিলো, এমন সময় একটী সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা এসে বিদ্ধ হলো লালারামের বুকে।

আর্তনাদ করে আসন থেকে ঢলে পড়লো লালারাম ভূতলে।

অকস্মাৎ আনন্দ উৎসব স্তব্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর আর রহমান ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়ালো। চোখ দুটো জ্বলে উঠলো বনহুরের। কঠিন কণ্ঠে বললো—কার এমন দুঃসাহস আমার আস্তানায় প্রবেশ করে লালারামকে হত্যা করলো? যাও দেখো---

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের অনুচরগণ দরবারকক্ষ ত্যাগ করে অশ্ব নিয়ে ছুটলো; কিন্তু কেউ তাকে খুঁজে পেলো না কে লালারামকে হত্যা করেছে।

ফিরে এলো অনুচরগণ বিফল হয়ে।

বনহুর ততক্ষণে লালারামের বুক থেকে ছোরাখানা তুলে নিয়েছে। বনহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান, যাও এই মুহূর্তে যে কোনো ডাক্তারকে নিয়ে এসো, লালারামের বুকে ছোরাখানা বিদ্ধ হলেও তার ফুসফুসে বা হৃৎপিণ্ডে বিদ্ধ হয়নি। যেমন করে হউক একে বাঁচাতেই হবে।

রহমান কালবিলম্ব না করে ছুটলো ডাক্তারের সন্ধানে।

লালারাম ছোরার আঘাতে মৃত্যুবরণ না করলেও সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়লো। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ে লালারাম ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হয়ে আসছে।

ওদিকে রহমান এক ডাক্তারের চেম্বারের সম্মুখে দাঁড়ালো। ডাক্তার সবেমাত্র কলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলো। রহমান দেখলো গাড়ির মধ্যে ড্রাইভার বসে বসে ঝিমুচ্ছে। রহমান একটু ভেবে নিলো, তারপর অদূরে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলো—বাঁচাও ভাই বাঁচাও--এমনভাবে শব্দটা করলো, যাতে শব্দটা বেশি দূরে না গিয়ে শুধু ড্রাইভারের কানে যায়।

ড্রাইভার চমকে উঠলো তাইতো। কে বাগানে?—গাড়ি থেকে নেমে ছুটলো বাগানের মধ্যে।

রহমান একটা পাইন ঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে ছিলো।

ড্রাইভার এদিক-সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগুচ্ছে, কোথা থেকে শব্দটা এসেছিলো। যেমন সে পাইন ঝাড়ের পাশে এসে পড়েছে অমনি রহমান তাকে পিছনে থেকে জাপটে ধরে ফেললো গলায় চাপ দিতেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো ড্রাইভার।

রহমান দ্রুতহস্তে ড্রাইভারের পোশাক খুলে পরে নিলো তারপর ড্রাইভারকে পাইন ঝাড়ের নিচে শুইয়ে রেখে গাড়ির ড্রাইভ আসনে এসে বসলো।

ঠিক সেই সময় ডাক্তারবাবু এসে বসলেন পিছন আসনে। একটি বয় ডাক্তারী ব্যাগটা এনে গাড়িতে রেখে গেলো।

গাড়ি ছুটলো উল্কাবেগে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর গাড়িখানা নির্জন পাহাড়িয়া পথে এসে পড়লো।

ডাক্তার বললেন—ড্রাইভার এ তুমি কোন পথে চলেছো?

রহমান এতোক্ষণ দক্ষ ড্রাইভারের মত গাড়ি চালিয়ে চলেছিলো। হঠাৎ ফিরে তাকায় সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে ধরে ডাক্তারের দিকে—খবরদার কোনোরকম আপত্তি করবেন না, আমার সঙ্গে যেতে হবে আপনাকে।

ডাক্তার বিস্মিত হতভম্ব—ড্রাইভারের আসনে এটা কে? কি উদ্দেশ্য এর? ফ্যাকাশে মুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন ডাক্তার।

রহমান বললো—আপনি দয়া করে সরে আসুন কারণ আপনার চোখে রুমাল বাঁধতে হবে।

ডাক্তার আপত্তি করার সাহস পেলো না, কারণ রহমানের চেহারা বলিষ্ঠ কঠিন মুখমণ্ডল আর তার হস্তের আগ্নেয় অস্ত্রটা ডাক্তারকে ভীত করে তুলেছিলো। বাধ্য হলেন তিনি রহমানের দিকে মাথাটা এগিয়ে দিতে।

রহমান একখানা কালো রুমাল বের করে ডাক্তারের চোখ দুটো বেঁধে ফেললো, তারপর বললো—ডাক্তারবাবু ভয়ের কোনো কারণ নেই, আবার আপনাকে পৌঁছে দেবো আর পাবেন প্রচুর অর্থ।

ডাক্তার নীরবে বসে রইলেন।

রহমান গাড়ি চালিয়ে গোরী পর্বত অভিমুখে চললো।

পাথুরে পথে অতি সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলো রহমান। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর পথ অতি দুর্গম হওয়ায় গাড়ি রেখে নেমে পড়লো রহমান, ডাক্তারকেও নামিয়ে নিলো সে গাড়ি থেকে।

রহমানের এক হস্তে ডাক্তারের হস্ত বিপরীত হস্তে ঔষধের ব্যাগ নিয়ে গোরী পর্বতের শৃঙ্গ অতিক্রম করে চললো। বারবার পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু।

রহমান তাকে সামলে নিচ্ছিলো সাবধানে।

একসময় পৌঁছে গেলো রহমান ডাক্তারসহ গোরী আস্তানায়।

বনহুর দলবল নিয়ে তখন লালারামকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। রহমান ডাক্তারসহ পৌঁছতেই খুশি হলো বনহুর।

নিজ হস্তে বনহুর খুলে দিলো ডাক্তারের চোখে বাঁধা কালো রুমালখানা।

ডাক্তারের চোখে ঝরে পড়লো রাজ্যের বিস্ময়। তিনি বনহুরকে দেখে প্রথমে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, ভাবলেন কে এই যুবক! বনহুরের সৌন্দর্য তাকে কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি করে ফেললো। তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলেন, যে স্থানে এখন তিনি এসেছেন সে স্থান স্বাভাবিক নয়, নিশ্চয়ই কোনো দস্যু বা ডাকাতের আস্তানা।

বনহুরকে লক্ষ্য করে এটাও ডাক্তার বাবু বুঝতে পারলেন—এই যুবকই দলপতি। তাই ডাক্তারবাবু তাকেই প্রশ্ন করলেন—আমাকে এখানে কেন আনা হলো বলো?

বনহুর বললো—রোগী দেখার জন্য। আসুন ডাক্তার বাবু ---বনহুর ডাক্তারসহ গুহার ভিতরে প্রবেশ করলো।

একটা শয্যায় মৃত পড়ে আছে লালারাম। তার চারপাশে দণ্ডায়মান অন্যান্য অনুচর। বনহুর ডাক্তারবাবুকে লক্ষ্য করে বললো—একে দেখুন ডাক্তার বাবু বাঁচানো যায় কিনা। যত অর্থ আপনি চান তাই দেবো।

ডাক্তার কিছুক্ষণ লালারামের সংজ্ঞাহীন বলিষ্ঠ সবল কঠিন দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এক পাশে একটা মশাল দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। মশালের আলোতে ডাক্তার সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এখন তাঁর চিন্তাধারা স্থির হয়েছে, বুঝতে পেরেছেন তিনি—এরা ডাকু। এখন এদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া একমাত্র উপায় হলো রোগীকে চিকিৎসা করে ভালো করা।

ঔষধের ব্যাগ খুলে রোগীর পাশে গিয়ে বসলেন ডাক্তার। ভয়-বিহ্বল কম্পিত হস্তে তুলে নিলেন লালারামের বলিষ্ঠ হাত খানা নিজের হাতে। পালস্ পরীক্ষা করতে লাগলো ডাক্তার।

বনহুর বুঝতে পারলো ডাক্তার ভয় পাচ্ছেন। সে আশ্বাস দিয়ে বললো—ডাক্তারবাবু আপনি ভীত হবেন না। নির্ভয়ে আপনি ওর চিকিৎসা করুন।

ডাক্তার সব পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর মনোযোগ সহকারে চিকিৎসা শুরু করলেন।

বনহুর বললো—ডাক্তারবাবু রোগীর জ্ঞান ফিরে না আসা অবধি আপনাকে আমরা এখানে আটকে রাখবো। রোগী সুস্থ্ হলে আপনাকে পৌঁছে দেবো আপনার বাড়িতে।

প্রতিবাদ করে কোনো উপায় নেই জেনে ডাক্তার রাজি হলেন অগত্যা। চিকিৎসা চললো লালারামের।

কয়েকদিনের মধ্যে লালারাম সুস্থ্ হয়ে উঠলো। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টায় ওকে বাঁচিয়ে তুললেন। প্রায় এক সপ্তাহ পর লালারাম যেদিন শয্যায় উঠে বসলো সেদিন দস্যু বনহুরের আনন্দ আর ধরে না।

ডাক্তাববাবুকে প্রচুর অর্থ দিলো বনহুর তারপর রহমানকে বললো—যাও রহমান, ডাক্তারবাবুকে তাঁর আবাসে পৌঁছে দিয়ে এসো।

রহমান বললো—আচ্ছা সর্দার।

তারপর ডাক্তারসহ রহমান ফিরে এলো গোরী পর্বতের সেই নির্জন স্থানে যেখানে ছিলো ডাক্তারের গাড়িখানা।

রহমান গাড়ির নিকটে পৌঁছে ডাক্তারের চোখের রুমাল খুলে দিলো, বললো—চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ডাক্তার বিনাবাক্যে গাড়িতে উঠে বসলেন।

রহমান বসলো ড্রাইভ আসনে।

গাড়ি ছুটলো পর্বতের গা বেয়ে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই হঠাৎ পর্বতের আড়াল থেকেই একটি গুলি এসে বিদ্ধ হলো গাড়ির টায়ারে। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বেরিয়ে গেলো চাকা থেকে।

থেমে পড়লো গাড়িখানা।

রহমান সম্মুখে তাকাতেই দেখতে পেলো, অদূরে গোরী পর্বতের পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি অদ্ভুত নীলাভো পোশাক-পরা নারীমূর্তি। মূর্তিটি যে নারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তার দেহের

পোশাকেই বেশ বুঝা যাচ্ছে। যদিও প্যান্ট পরা গায়ে জামা পায়ে বুট কোমরে বেল্ট-রিভলভারের খাপ মাথায় পাগড়ী, পাগড়ীর কিছুটা অংশ দিয়ে মুখের নিচের অংশটা ঢাকা রয়েছে। দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রিভলভার। রিভলভারের গুলিই যে তাদের গাড়ির চাকায় বিদ্ধ হয়েছে বুঝতে পারে রহমান।

গাড়িখানা থেমে পড়তেই ডাক্তার নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে অস্ফুট ভয়ার্ত শব্দ করে উঠলেন—রাণী দুর্গেশ্বরী কিন্তু ডাক্তারের কণ্ঠ থেমে গেলো মুহূর্তে।

একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো ডাক্তারের পাঁজরে।

তীব্র আর্তনাদ করে ডাক্তার মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো গাড়ির মেঝেতে।

রহমান ফিরে তাকিয়ে দেখলো, নারীমূর্তি রিভলভার বাম হস্তে ধরে দক্ষিণ হস্তে ছোরাখানা নিক্ষেপ করেছিলো। রহমান ফিরে তাকাতেই দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলো পর্বতের আড়ালে।

রহমান শুনতে পেলো ঘোড়ার খুরের শব্দ।

রহমান দেখলো, ডাক্তার বাবুর প্রাণবায়ু বিলীন হয়ে গেছে অসীম আকাশে। হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করছে কিন্তু দুঃখ করার সময় এখন কই! রহমান এবার গাড়ি থেকে নেমে ছুটলো যেখানে একটু পূর্বে সেই অদ্ভুত নারীমূর্তিটিকে দেখেছিলো সে।

কিন্তু সেই স্থানে পৌঁছে দেখলো কিছুই নেই—চারদিকে শূন্য, বাতাস বইছে সাঁ সাঁ করে। বাতাসে শোনা যাচ্ছে ক্ষীণ একটা শব্দ খট্ খট্ খট্--

নতুনমুখে এসে দাঁড়ালো রহমান, মুখভাব গম্ভীর থমথমে। দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ একখানা ছোরা।

বনহুর তখন গোরী আস্তানায় দরবারকক্ষে বসে ছিলো তার পাশে বসে লালারাম সর্দার। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিলো। লালারাম এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়।

রহমান এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো দরবারকক্ষের সবাই। বনহুরও চমকে উঠলো কারণ রহমানের মুখোভাব অত্যন্ত ভাব গম্ভীর ছিলো। তাছাড়াও তার হাতে এখানা রক্তমাখা ছোরা।

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—কি ব্যাপার রহমান?

সর্দার, ডাক্তারবাবু নিহত হয়েছে। কোন ভূমিকা না করেই বললো রহমান।

বনহুর যেন আর্তনাদ করে উঠলো—কি বললে রহমান ডাক্তার নিহত হয়েছে?

হাঁ সর্দার। এই দেখুন---ডাক্তারের বুক থেকে তুলে নেওয়া ছোরাখানা রহমান বনহুরের সম্মুখে তুলে ধরলো —এ ছোরা দিয়েই ডাক্তারকে হত্যা করা হয়েছে।

বনহুর ছোরাখানায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠলো। ছোরাখানা হাতে নিয়ে বললো—এ যে দেখছি ঐ ছোরা যে ছোরা দ্বারা লালারামকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিলো। তখনই বনহুর আদেশ দিলো—লালারামকে যে ছোরা দ্বারা হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিলো সে ছোরাখানা কোথায় নিয়ে এসো।

অল্পক্ষণেই সেই ছোরাখানা আনা হলো।

বনহুর ছোরা দু'খানা একই স্থানে রেখে পরীক্ষা করে বললো—আশ্চর্য এ ছোরা দু'খানা একই রকম দেখছি।

রহমান বললো—সর্দার, ছোরা নিক্ষেপকারী পুরুষ নয়—নারী।

বনহুর অস্ফুট শব্দ করে উঠলো—নারী?

হাঁ সর্দার। রহমান সমস্ত ঘটনা বলে গেলো বনহুরের কাছে।

সব শুনে বনহুর শুধু অবাকই হলো না তার মনে আর একটি দোলা জাগলো—কে এই অদ্ভুত নারীমূর্তি? যে শুধু লালারামকেই হত্যা করতে চেষ্টা করেনি, ডাক্তারটিকে হত্যা করলো। ছোরা দু'খানা যে একই হস্তে নিক্ষিপ্ত তাতে কোনো রকম ভুল নেই।

বনহুর পুনরায় ছোরা দু'খানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো। ছোরা দু'খানার বাটে অদ্ভুত সিংহী মূর্তি আঁকা রয়েছে। ছোরার বাটগুলো স্বর্ণতৈরি। কোনো নিপুণ কারিগর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে ছোরাগুলো।

বনহুর যখন ছোরা দু'খানা হাতে নিয়ে ভাবছে তখন লালারাম বলে উঠলো—দস্যুসম্রাট আপনি ছোরা দু'খানা দর্শন করে বিস্মিত হয়েছেন বুঝতে পেরেছে। ছোরা দু'খানার নিক্ষেপকারী নারী এবং সিংহীর মত হিংস্র আর ভয়ঙ্কর সে।

রহমান বললো—সর্দার ডাক্তার সেই অদ্ভুত নারীমূর্তি লক্ষ্য করে ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বলেছিলো-রাণী দুর্গেশ্বরী---

লালারাম ঢোক গিলে বললো—হাঁ, সর্দার ঐ ছোরা দু'খানা রাণী দুর্গেশ্বরী দেবীর— লালারামের কণ্ঠ কেঁপে উঠলো থর থর করে।

বনহুর তাকালো লালারামের মুখে ছাই এর মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখমণ্ডল। চোখ দুটো ভয়কাতর ম্লান মনে হলো।

বনহুর বুঝতে পারলো রাণী, দুর্গেশ্বরী দেবী সাধারণ নারী নয়। লালারামের মত জনও তাকে যমের মত ভয় করে। দুর্গেশ্বরী তাকে হত্যা করেছিলো আর কি। *হত্যা করলো অসহায় ডাক্তারটিকে। কতবড় সাংঘাতিক আর ভয়ঙ্কর এই নারী বুঝতে বাকি রইলো না দস্যু বনহুরের।

বনহুরের ভ্রু দু'টি কুঞ্চিত হয়ে উঠলো, দুর্গেশ্বরী দেবী তাহলে বনহুরের গোরী আস্তানার সন্ধানও জানে। একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো তার মুখমণ্ডলে—কে এই নারীমূর্তি?

লালারাম বনহুরের মনোভাব বুঝতে পারলো যেন বললো সে—সর্দার একটি কথা আপনাকে বলা হয়নি এখনও।

বলো কি বলতে চাও?

রাণী দুর্গেশ্বরীর কবল থেকে আমার রক্ষা নেই। তার হাতেই আমাকে জীবন দিতে হবে সর্দার---

বনহুর তীক্ষ্ণ নজরে তাকালো লালারামের মুখের দিকে।

লালারামের চোখ দুটো কেমন নিষ্প্রভম্লান হয়ে এসেছে যেন ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো আবার—রাণী দুর্গেশ্বরীর দলেই একদিন আমি ছিলাম, কোনো এক কারণে আমি তার দল থেকে চলে আসি। থামলো লালারাম। হয়ত বা ভয় হচ্ছিলো, কখন কোন্ দিক থেকে দুর্গেশ্বরীর নিক্ষিপ্ত ছোরা এসে বিদ্ধ হয় তার বুকে।

বনহুর বললো—লালারাম রাণী দুর্গেশ্বরী কে তাই আমি জানতে চাই?

এখানে নয়, চলুন সর্দার আপার বিশ্রামকক্ষে। রাণী দুর্গেশ্বরী আমাকে বলবার সুযোগ নাও দিতে পারে।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো—চলো, তাই চলো—আমার বিশ্রাম কক্ষেই চলো লালারাম।

লালারাম মাঝখানে তার দক্ষিণ পাশে বনহুর, বাম পাশে রহমান এগিয়ে চললো গোরী আস্তানার গোপন কক্ষে।

লালারাম এখন সম্পূর্ণ সুস্থ নয় সে বুকে হাত রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলো। হয়তো বা হাঁটতে তার কষ্ট বোধ হচ্ছিলো তাই সে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছে।

বনহুর বললো—লালারাম তোমার চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি?

না সর্দার, খুব কষ্ট হচ্ছে না।

পারবে এতটা পথ চলতে?

না পারলেও আমাকে পারতে হবে সর্দার। কারণ আমার মৃত্যু নিশ্চিত---থামলো লালারাম হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিয়ে আবার চলতে আরম্ভ করলো—আমাকে আরোগ্য করার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ডাক্তারবাবু। ডাক্তার সম্পূর্ণ নির্দোষ—তাকেও দুর্গেশ্বরী ক্ষমা করলো না। আর আমাকে সে জীবিত রাখবে এ কখনই হতে পারে না। মরতে যখন হবেই তখন সব বলেই মরবো সর্দার---

বনহুর আর রহমান দু'দজন একসঙ্গে তাকালো যন্ত্রচালিত পুতুলের মত লালারামের মুখের দিকে।

লালারাম রীতিমত হাঁপাচ্ছে অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হচ্ছিলো তাকে।

বনহুর সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে বললো—মিছে মিছে তুমি বেশি চিন্তিত হচ্ছো লালারাম। আমি তোমাকে আমার কান্দাই আস্তানায় নিয়ে যাবো। সেখানে কারো সাধ্য নেই তোমাকে হত্যা করে।

সর্দার, সে সুযোগ আসবে কিনা কে জানে। আমি জানি দুর্গেশ্বরী আমাকে হত্যা করবেই—একটু পা চালিয়ে চলুন—সব বলবো আমি, সব বলবো।

লালারাম যতদূর সম্ভব জোরে চলতে লাগলো। বনহুর নিজে লালারামের চলায় সাহায্য করার জন্য দক্ষিণ হস্তখানা দিয়ে ধরে ফেললো তাকে।

সেই মুহূর্তে আচম্বিতে একখানা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো লালারামের বুকের ঠিক মাঝখানে। তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো লালারাম—সর্দার --- কিন্তু আর কোনো শব্দ সে উচ্চারণ করতে পারলো না। কারণ তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চলে গিয়েছিলো ছোরাখানা।

বনহুর আর রহমান লালারামের দেহটাকে শক্ত করে ধরে ফেললো।

বিস্ময়ভরা নজরে বনহুর আর রহমান তাকালো সম্মুখে, কিনতু কিছুই নজরে পড়লো না। কোথা থেকে ছোরাখানা এসেছিলো তাও বুঝতে পারলোনা তারা।

লালারামের দেহটাকে ভূতলে শুইয়ে দিয়ে মাথাটা তুলে নিলো বনহুর নিজের কোলের উপর, ছোরাখানা তুলে নিল একটানে ওর বুক থেকে। অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো, ছড়িয়ে পড়লো বনহুরের চোখেমুখে।

রহমানও হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলো লালারামের পাশে, অধর দংশন করলো রহমান ব্যথা বেদনায় মুখখানা তার কালো হয়ে উঠলো।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—লালারাম শুনে যাও—রাণী দুর্গেশ্বরী যেই হউক তাকে দস্যু বনহুর ক্ষমা করবে না---

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ায় ভেসে এলো নারীকণ্ঠের অদ্ভুত হাস্যধ্বনি, খিল খিল করে কেউ যেন কোথাও হেসে উঠলো।

বনহুর লালারামের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো ছুটে বেরিয়ে গেলো বাইরে। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না সে, শুধু তার কানেএলো অশ্বপদ শব্দ—খট্ খট্ খট্ —দূরে---- অনেক দূরে কেউ যেন ঘোড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে।